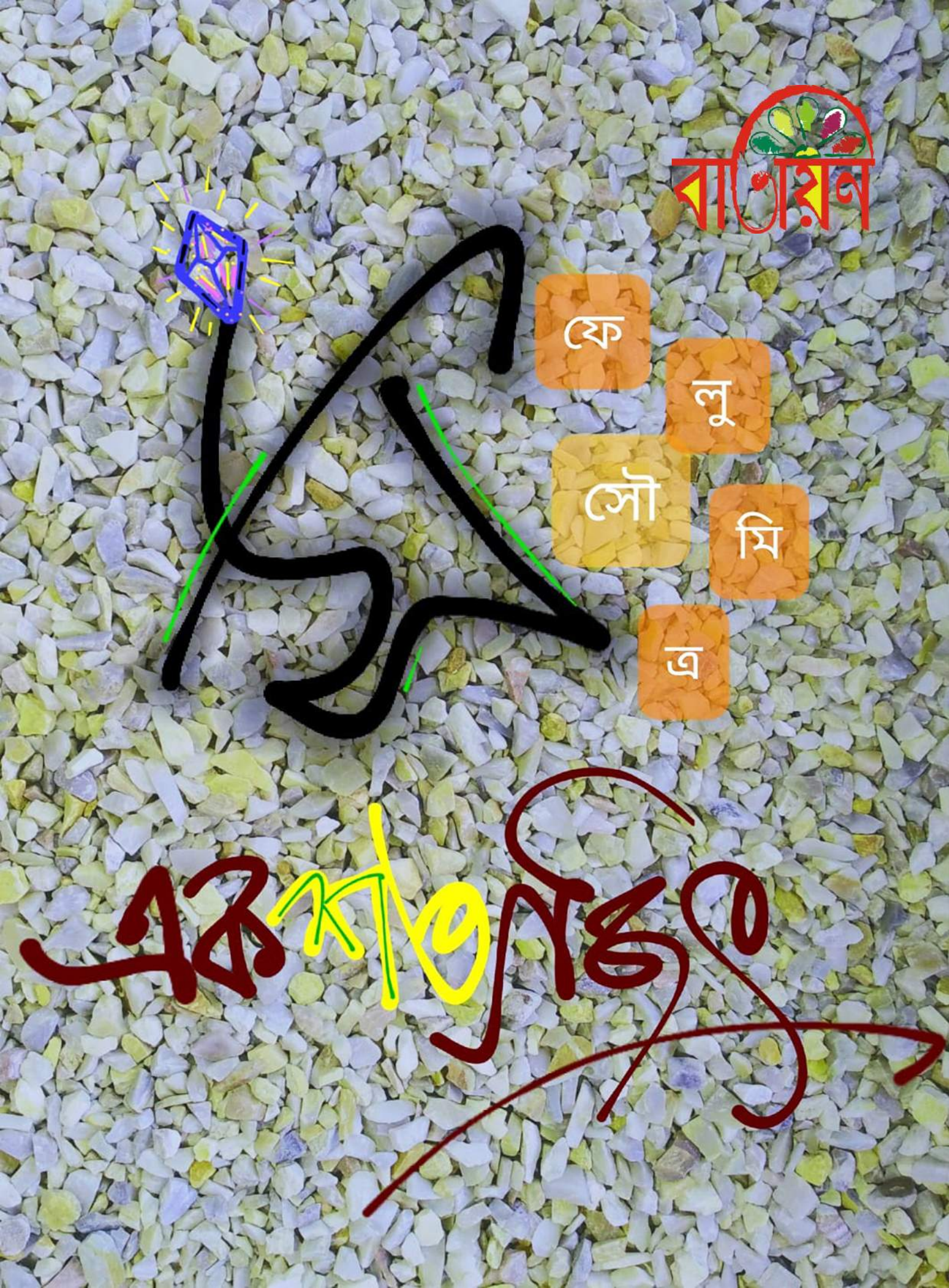

বাতায়ন
ফেলু সৌমিত্র
একশালিক

তোমার আরোগ্য চাই

(সত্যজিৎ রায়কে)

তোমার আরোগ্য চাই, তুমিই যেহেতু
সুস্থতা ও আমাদের মাঝখানে অনিবার্য সেতু।
প্রাচীন নিসর্গ আছে তার কাছে ঋণী
তো মানুষ, তবু তার কাছে আমরা ফিরিনি
শিল্পও নয়, মায়ামারীচের পিছে পিপাসার্ত ছুটেছি পথিক
পথহারা; তুমিই অরুগ্ন পথ স্বপ্নের পারিশ্রমিক
তোমাকেই দেব ব'লে আসি, তুমি সুস্থ থাকো
এই মানচিত্রে আজও তুমি সুন্দরের সাঁকো।

– সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং

Batayan

সম্পাদিকা
রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

Volume 24 | April, 2021

A literary magazine with an International reach

বাতায়ন

Issue Number 24 : April, 2021

Editor
Ranjita Chattopadhyay, IL, USA

Sub Editor (Volunteer)
Sugandha Pramanik
Melbourne, Australia

Design & Art Layout
Kajal & Subrata, Kolkata, India

Website Support
Susanta Nandi, India

Chief Editor & CEO
Anusri Banerjee
Perth, Western Australia
a_banerjee@iinet.net.au

Published By
BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Photo Credit

Supratik Mykherjee **Front Cover**

অধমের নাম **সুপ্রতীক মুখার্জী** । পার্থিব বাসিন্দা । ৯টা-৫টার চাকর । পিদিমের মত টিম্‌টিমে বুদ্ধি, তা'ও নেভে না !!

Abhishek Roy **Title Page**

Abhishek Roy is an avid art enthusiast who has interest in different forms of visual and performing arts. A diploma in fine arts, Abhishek is an ameteur theater actor, photographer, founder member and presenter of a community radio/podcast platform in Chicago, a musician and a film aficionado.

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত । প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ । রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

পৃথিবীর মুখে দুই বাঙালীর মুখ

বাংলা নববর্ষ এসে গেল। দুয়ারে অপেক্ষমান ১৪২৮। অতিমারীর ছায়া সরে যায় নি পৃথিবীর বুক থেকে। কিন্তু আশায় বুক বেঁধে নতুন বছরকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত আমরা । পয়লা বৈশাখ – বাঙালিয়ানার উদযাপনের শুভ মুহূর্ত। বাঙালিয়ানা একটি বহুস্তরীয় শব্দ। সময়ের সঙ্গে অন্য সবকিছুর মতোই পরিবর্তিত হয়েছে বাঙালিয়ানার সংজ্ঞা। কিন্তু অপরিবর্তিত থেকে গেছে একটি বিষয়। নববর্ষে আজও বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বাঙালী নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে নতুন করে তুলে ধরতে চেষ্টা করে নিজেদের কাছে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে। হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও দুদণ্ড ভাবে তার উজ্জ্বল উত্তরাধিকারের কথা।

"চেনা নক্ষত্রের দীপ্তি গ্রামে গঞ্জে সমস্ত বিদ্যুৎ কোথায় মিলিয়ে গেল
সবকিছু ছাড়তে ছাড়তে কিছু রইল না তুমি ছাড়া তোমার ক্লান্তি
বিষণ্নতা তারই মধ্যে তোমার অনির্বাণ অভিব্যক্তি। সবকিছু এই পৃথিবী
থেকে হারিয়ে যাচ্ছে তবু এ পৃথিবী বদলে যাবে এই আকাঙ্ক্ষাকে আমি
আজও পথের পাশে নামিয়ে রাখতে পারলাম না সমস্ত ক্ষতির মধ্যে
ভোরবেলার সুর এখনও শুনতে পাই, তুমি হাত ধরে থাকো।"

আশা নিরাশার দোদুল্যমানতা। কৃষ্ণগহরের গভীর অন্ধকার আহ্বান করে নক্ষত্রের আলো। পড়ে থাকা ভস্ম থেকে জন্ম নেয় নতুন কবিতা। সব ক্ষতি পার হয়েও কবি শুনতে পান ভোরবেলার সুর। কবির নাম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। আজ বাঙালী হিসেবে যখন নিজের আলোকময় উত্তরাধিকারের দিকে ফিরে তাকালাম, বাঙালিয়ানার মূর্ত প্রতীকরূপে চেতনা ও অনুভূতি জুড়ে দাঁড়ালেন দীর্ঘদেহী, সুদর্শন ও স্বর্ণকণ্ঠের অধিকারী এই মানুষটি। রাতের তপস্যা একদিন শুভদিন আনবেই, – এ বিশ্বাস ছিল তাঁর চিত্তের গভীরে। এই সদর্থক ভাবনা তাঁর অর্জিত জীবনদর্শন। এ দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর দীর্ঘ জীবনব্যাপী নানা কাজে আর ব্যক্তিগত যাপনে। তাঁর সৃষ্টিশীলতা যে শুধু কবিতা রচনা করেই ক্ষান্ত হয় নি এ তথ্য বাঙালীমাত্রেই জানেন আজ।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ হয়েছে অনেক। এখনো হচ্ছে। ভবিষ্যতেও হবে। আর সেটাই স্বাভাবিক। বড় মাপের যেকোন ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধেই একথা বলা যায়। তাঁরা কিছুটা কমল হীরের সঙ্গে তুলনীয়। নানাদিক থেকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখা ! আর মুগ্ধ হওয়া ! সবদিক থেকেই আলোর বিচ্ছুরণ। ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৩৫ – ১৯শে নভেম্বর, ২০২০ – সৌমিত্রর ৮৫ বছরের এই জীবনকাল বাঙালী মননকে সমৃদ্ধ করেছে বহুদিক দিয়ে। বুদ্ধিদীপ্ত যুবক নায়ক রূপে বাঙালী চলচ্চিত্রের দর্শককে যেমন বহুকাল ধরে মুগ্ধ করেছেন তিনি, তেমনই ৬৫ বছর ধরে অটুট থেকেছেন বাংলা রঙ্গমঞ্চের এক গুরুত্বপূর্ণ মিনার হিসেবে। তারই পাশাপাশি চলেছে নাটকের অনুবাদ, কবিতা ও প্রবন্ধ লেখার কাজ – আবৃত্তি ও সাক্ষাৎকারদান। তাঁর বাল্যবন্ধু ও বিখ্যাত প্রাবন্ধিক সুধীর চক্রবর্তী 'দেশ' পত্রিকার ২রা ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত 'আমার বন্ধু পুলু' শীর্ষক প্রবন্ধে যথার্থই বলেছেন, "তার অশীতিপর জীবনের সবটাই ছিল সক্রিয় ও ফলবান।"

১৯৫৯ সাল। বাংলা চলচ্চিত্রের জগতে একটি উল্লেখযোগ্য বছর। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ছবি 'অপুর সংসার'

মুক্তি পেল। সব বাঙালীর ভিতরের অপু সেলুলয়েডের বড় পর্দায় মূর্ত হয়ে উঠল এক নতুন নায়কের মধ্যে দিয়ে। সৌমিত্র তাঁর অভিনয়জীবন তথা নায়কজীবন শুরুই করলেন সত্যজিৎ পরিচালিত চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে। যথার্থ শিল্পী অভিনেতা ও প্রকৃত শিল্পী পরিচালকের এই যুগলবন্দী আজ বিশ্ববন্দিত। যে সময়ে এই দুই প্রতিভা মুখোমুখি হয়েছিলেন তখন দুজনেরই প্রয়োজন ছিল দুজনকে। যেকোন অভিনেতার মতোই সৌমিত্রের প্রয়োজন ছিল যথাযথ পরিচালক ও চিত্রনাট্যের। তা নাহলে তাঁর পক্ষে নিজের অভিনয়কুশলতা তুলে ধরা সম্ভব না হলেও হতে পারতো। আর সত্যজিৎ খুঁজছিলেন এমন একজন নায়ককে যিনি চিত্রায়িত করে তুলবেন তাঁর নীরব ভাষাকে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম ও ভূমিকা তাই সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ছায়াছবির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সত্যজিতের মোট চোদ্দটি ছবির প্রায় প্রতিটিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনয় করেছেন প্রধানতম চরিত্রে। "আন্তর্জাতিক 'আর্ট হাউস' ছবির দুনিয়ায়, ভারতবর্ষের চলচ্চিত্রের সর্বোত্তম মুখ যদি হন সত্যজিৎ রায়, তবে সত্যজিতের শিল্পনির্মাণ ও তাঁর জীবনভাষ্যের প্রধানতম মুখ ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।" (রূপবান সান্তা ক্লসের ঝুলি : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, একটি অসম্পূর্ণ মূল্যায়ন /ব্রাত্য বসু)

সত্যজিৎ রায় – বাংলা সংস্কৃতির জগতে এক Colossus. বিশ্ববাসীর কাছে তাঁর মুখ্য পরিচয় শিল্পোত্তীর্ণ চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে কিন্তু বাঙালীর কাছে তিনি এক আইকনিক ব্যক্তিত্ব। বাংলা চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গে সৌমিত্র-সত্যজিতের যোগসূত্রটির উল্লেখ। আর তা থেকেই প্রসঙ্গান্তরে এ লেখায় এলেন সত্যজিৎ রায় নামের বিশাল ব্যক্তিত্বটি। তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর পর্দা ও পর্দাপারের জগৎ ছাড়িয়ে আরো সুদূরপ্রসারী। তিনি বাংলা ছায়াছবির জগতের রাজাধিরাজ। তবে সাহিত্যে, সম্পাদনার জগতে, রংতুলির রাজ্যে তাঁর বর্ণময় ও আলোকোজ্বল উপস্থিতি। পাহাড়ের মতো উচ্চতার এই মানুষটির সম্বন্ধে কিছু লিখতে যাওয়া ধৃষ্টতা। কিন্তু তাও তো ইচ্ছে করে। ষাট বা সত্তরের দশকে বাঙালী শিশু কিশোরের বেড়ে ওঠার দিনগুলিতে ফেলুদা, তোপসে, জটায়ু বা প্রফেসর শঙ্কু ছিল আদর্শ মানসসঙ্গী। তাদের মনে আঁকা হয়ে যেত 'সন্দেশ' এর প্রচ্ছদ। আর কে না জানে মানুষের হৃদয়ে সবসময় একটুকরো শৈশব বয়ে নিয়ে বেড়ায়। জীবিকার তাগিদে সেই শিশু বা কিশোর যেখানেই থাকুন না কেন বুকের মধ্যে সত্যজিৎ রায় তাই রয়েই যান। সেই ভাললাগা আর শ্রদ্ধার কথা ভাষায় প্রকাশ করার তাগিদ থেকেই জন্ম নেয় কিছু লেখা। বাতায়নের সত্যজিৎ-সৌমিত্র স্মারক সংখ্যার নিবেদন সেইরকম একগুচ্ছ রচনা।

২০২১ এর মে মাসে সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবার্ষিকী। মাত্র কয়েকমাস আগেই প্রয়াত হয়েছেন তাঁর স্ব-নির্বাচিত নায়ক। সৌমিত্র তাঁর 'ফলবান ও সক্রিয়' জীবনযাপনের মধ্যে দিয়ে এক চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। সৌমিত্র-সত্যজিৎ, – এই যুগল ব্যক্তিত্বের আলোকবৃত্তে ঘুরছি আমরা। তাঁদের প্রতিভার মূল্যায়ন একদিকে যেমন করেছেন স্বনামধন্য কবি, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার ও অভিনয় জগতের কুশীলবেরা তেমনি আমরা, সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষেরা, যারা তাঁদের আমাদের শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলোতে আদর্শ 'হিরো' র আসনে বসিয়েছি তাদেরও বলার কথা আছে অনেক। তাঁদের প্রতিভার ব্যাপ্তি ও গভীরতা সম্যক না বুঝেও হৃদয়ের এক নিবিড় ভালবাসার জায়গা থেকে উঠে আসা সেইসব কথা দিয়ে 'বাতায়ন' পত্রিকার শ্রদ্ধাঞ্জলি সাজান হল 'ঋতুরাজ বসন্তের মতোই পূর্ণতায় মহীয়ান' এই দুজন মানুষের জন্য। এই সংখ্যার প্রবন্ধ, স্মৃতিচারণ, কবিতা ও চিত্রশিল্পে তাঁদের প্রতিভার মূল্যায়নের বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা নেই। আছে শুধু শ্রদ্ধাপূর্ণ মুগ্ধতা।

বাতায়নের বন্ধুদের জন্য এই সংখ্যাটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। সকলে ভাল থাকবেন। সুস্থ থাকবেন। বাংলা নববর্ষ ভাল কাটুক সকলের। নতুন বাংলা বছর সার্থক হোক সকলের। বাঙালিয়ানা আরও তাৎপর্য্যময় হয়ে উঠুক।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছাসহ,

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক, 'বাতায়ন' পত্রিকা গোষ্ঠী

সূচীপত্র বাতায়ন

সুপ্রতীক মুখোপাধ্যায় 7

ফেলু-র জিৎ

সঞ্জয় চক্রবর্তী 8

ঋজু

ইন্দিরা চন্দ 9

ফেলুদার খোঁজে

Suparna Chatterjee 11

Eulogy to Ray, hundred years on …

তনিমা বসু 13

আমার চোখে সত্যজিৎ

দেবীপ্রিয়া রায় 14

সৌমিত্র

শঙ্খ ভৌমিক 19

উদয়ন পণ্ডিতকে লেখা ব্যক্তিগত মোনোলগ

সিদ্ধার্থ দে 21

মণিকাঞ্চন যোগ : সত্যজিৎ সৌমিত্র

শ্রাবণী রায় আকিলা 28

স্মৃতিতে সত্যজিৎ, হৃদয়ে ফেলুদা

মহুয়া সেন মুখোপাধ্যায় 32

ছোটো গল্পকার সত্যজিৎ ও সাধারণ মানুষগুলি

তাপস কুমার রায় 37

সৌমিত্র চ্যাটার্জি থেকে সৌমিত্র কাকু

অম্লান বোস 40

সৌমিত্রদা , তুমি চলেই গেলে ?

সৌমিত্র চক্রবর্তী 46

সৌমিত্রের চোখে সৌমিত্র

ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায় 48

সৌমিত্র স্মরণে

জয়ন্তী বন্দ্যোপাধ্যায় 52

দেখা

সুদীপ্ত ভৌমিক 58

থিয়েটারের সৌমিত্র

শ্যামলী আচার্য 62

শিশিরের ছায়া

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায় 69

মহারাজা সেলাম

সুবীর রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 66

সৌমিত্র আর আমি

সুপ্রতীক মুখোপাধ্যায়

ফেলু-র জিৎ

যদি ফেলু ফেল্ করতো
সত্য তবে জিততো না !
স্বপ্ন যদি মুখ ফেরাতো
স্মৃতি মিঠে হাসতো না
মগন্ যদি চলতো ডালে
ফেলু চলতো পাতায়
হাzরা-কে কাৎ দাবা-র চালে
খুনে খরচা-র খাতায় ।
স্মৃতির রেণু
ছড়িয়ে আছে
পাতার ভাঁজে, আলো ছায়ায়
একখানি ফুঁ
লাগলো যেই,
একশো মাণিক
জ্বললো সেই
দৌড়ে ফিরি খেলার বেলায় ।
কাটলো বেলা
খুঁজেই চলি
কোথায়’ সে চরিত্র !
বন্দুকেতে সুড়সুড়ি দেয়
মগজেতে আঁকশি লাগায়
তোমার আমার
পাড়ায় কি আর
পাবো, ফেলু মিত্র !!

সঞ্জয় চক্রবর্তী

ঋজু

কেশশুভ্রে আলোর ছোঁয়া সাঁঝ গোধূলির কিছু,
হাজার নীচু মাথার মাঝে অবক্র ও ঋজু।

তাকে ছুঁতে চাইছিলো লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশানে।
সে যে কখন আকাশ ছুঁলো ক'জনইবা জানে ?

একটু ছুঁতে চেয়েছে মানুষ, আবেগ মাখা দিন ...
কখনও সে হোমাপাখি কখনও কিং লিয়ারের সিন।

আমরা দেখি মাঠ উঁজিয়ে কাশের ঝাড় থেকে
রেলগাড়ি, সে মিলিয়ে গেল স্টেশন ফেলে রেখে।

আজ বড় রাত, আসুক নেমে দু এক কুচি তারা,
পথ চিনে নিক ভবিষ্যতের আগাম প্রজন্মরা।

অংশুমানের ছবির ফ্রেমে মধুরা যেমন থাকে,
শালপ্রংশু প্রদ্যুত তাকে আগলে আগলে রাখে।

চরিত্র ফেরে পর্দাতে তার স্মৃতিও ফেরায় কিছু,
আনত করায় মাথা। সে আজও অবক্র ও ঋণ্ডু।

ইন্দিরা চন্দ

ফেলুদার খোঁজে

টেলিফোন টা উঠলো বেজে
ওপাশে ফেলুদা র গলা
'তপসে ready থাকবি বিকেলবেলা
দেখা হবে, ছদ্মবেশে দাড়ি গোঁফ, আর ঝোলা'

টেলিফোন টা গেল কেটে
তপসে বলে, কোথায় যাবো ? গন্তব্য কোনদিকে ?
'কুছ পরওয়া নেহি!' লালমোহন বাবু বলেন হেঁকে
'ফেলুবাবু যখন বলেছেন দেখো না ধৈর্য্য রেখে'

ঠিক পাঁচটায় দুবার বাজলো হর্ণ
'তপসে উঠে এসো গাড়িতে'
পরচুলা আর দাড়িতে
লালমোহন বাবু বললেন 'বম্ কালী'
আওড়াতে আওড়াতে ...

গাড়ি ছুটলো টালা র এক পুরোনো বাড়ির দিকে
একচিলতে ছাদের পাশে সংসার এক কামরায়
এক দিকে রেলগাড়ির স্বপ্ন অন্য দিকে ছেঁড়া পর্দা ওড়ে জানলায়
ফেলুদা তিনি নাকি এখানে অপূর্ব কুমার রায় !

'প্রদোষ মিত্রই কি অপূর্ব রায়! Highly suspicious! ব্যাপারটা কি বুঝলে হে তপসে ?'
'গুলিয়ে যাচ্ছে লালমোহন বাবু' তপসে বলে চিন্তায় চোখ বুজে
গাড়ি চলে কলকাতা ছাড়িয়ে গ্রাম বাংলার সবুজে
ফেলুদার ছবি দেখিয়ে পৌঁছায় ওরা কালীকিংকর চৌধুরীর দালান কোঠায় অনেক খুঁজে খুঁজে

একি এ যে একেবারে অন্য রূপ, স্বপ্ন চোখে, মন উন্মুখ
'উমাপ্রসাদ, দয়াময়ীর স্বামী, ব্যাচেলর ক্লাবের এমন পরিণতি আশা করিনি আমি'
হতাশ লালমোহন বাবু বলে ওঠেন নৌকা যখন উজান গামী
কাদা মাখা শহুরে অমূল্যর সাথে মৃন্ময়ীর দেখা, এ দৃশ্য বড়ই দামি

'নাহ, এখানেও ফেলুদাকে গেল না পাওয়া,' তপসে বলে ওঠে
'Do not worry Tapas babu what we are following
Leads to the Rajput driver whose name was Narsingh
সেই অভিযানে সামিল হলেই ব্যাস every thing matching!!'

‘ফেরা যাক কলকাতা তবে, কি বলেন লালমোহন বাবু ?’
এখানে যখন পেলাম না তাঁর দেখা
হয়ত, সেই রোমান্টিক অমল বা কাপুরুষ অমিতাভ কলকাতার রাস্তায় ঘুরছে একা একা
‘চল, ফিরে যাই’, লালমোহন বাবুর গলায় বিষাদ মাখা

এর পর উঠে আসে আরো কত নাম কত ছবি, কত পরিচয়
পালামৌর জঙ্গলে যে যুবক অসীম, সেই আবার কালের কাছে পরাজিত গঙ্গাচরণ
কখনও সন্দীপের মতো উদ্দাম প্রাণবন্ত অথবা তার উদয়ন পন্ডিতের মতো বিদ্রোহী মন
আরো আছে সেই স্বচ্ছমনা প্রশান্ত আর ডাক্তার গুপ্ত যে সৎ এবং সমাজ সচেতন।

তাহলে ফেলু মিত্তির গেলো কোথায় ? তপসে, লালমোহন বাবু বসে বসে ভাবে
উটের পিঠে চড়ে মরুভূমির বালি মেখে মুকুলের সাথে তবে কি সোনার কেল্লায় ?
নাকি সেখান থেকে বেনারসের অলি গলি, ঘুরে ক্যাপ্টেন স্পার্কের ডেরায়
ঐ যে লালমোহন বাবু দেখুন, বলে তপসে,
ফেলুদা মছলিবাবার ছদ্মবেশে মগজাস্ত্র দিয়ে মগনলালের আঁশ ছাড়ায়।

Suparna Chatterjee

Eulogy to Ray, hundred years on …

Into a haze of smoke, I walk in,
An early morning's sun it was then.
Old age I expected to sight
As he sat still with his mighty height.

Reading and absorbing words in silence
Like learning and praying,
Both wrapped in soft day light.
He looks up curious,
'T'is some little girl' tapping his chamber's floor,
He must have thought,
And distinctly I remember this and nothing more.

Each year I grew, borrowing wisdom from Life
Plainly felt, I've seen God in flesh
And those dreaming eyes,
Like flickering candle light
Casting shadows long on the floor,
Will remain clasped to my mind
For ever and ever more.

My tongue remained stuck in the jaw
Once I read, you're no more.

I didn't talk to you, but I prayed to recover you,
I never could tell if my prayers were not true
Or if it was destiny that could only spare you.

Relish in Grand Prix to Oscar, nine days left to birthday
Yet you became another of death's prey.

As a film-maestro you took leave
While empty remains stage,
Thousand tear-soaked eyes lament
The heartbreak, you underwent.

Every time I close my eyes
Behind high-piled books I see you,
Sitting immobilised, reading, and you soliloquise
Night's starry face, fairy power's win and magic,
All wrapped in the hands of chance's way
For movies acclaimed both in home today and far away.

On their knees, world pay homage to you
As you've won people's heart,
Like Holy Grail, love's offered
And the chalice filled to every part.

The train that went
Through the village of Nischindipur
Took the creator away,
Yet, hundred years on
Good film making, You still represent.

তনিমা বসু

আমার চোখে সত্যজিৎ

কোনটা মোদের দেশ ? বিদেশ বা কোনটা ?

হাতে তালি দিতেই যদি পৌঁছে যেতাম আমার মায়ের কোলে বেশ হতো তাই না । যেখানে মিঠে রোদ গায়ে লাগিয়ে কমলালেবুর কোয়া মুখে সন্দেশের পাতা ওল্টানো যায় ।

আবার নরম গরম সন্দেশ মুখে মিলিয়ে যায় মূহুর্তে ।

ভূতের রাজার বর একটিবার পেয়ে গেলে আর চিন্তা থাকতো না । ভূরিভোজ করানো যেত এক নিমেষে । কি মজার দেশ তাই না ।

অপুর মতো আমরা ও জীবন যুদ্ধে নেমেছি নিজেদের মতো করে । ফেলে এসেছি আমাদের মেয়েবেলা ও ছেলেবেলা আরেক দেশে । চলো যত্ন করে সাজাই এই ডালি ।

দেবীপ্রিয়া রায়

সৌমিত্র

পর পর এগারোটা তোপ পড়ল কেওড়াতলা শ্মশানের তোরণে । বিপুল জনতা যারা উচ্ছসিত শোকের আবেগে এতক্ষণ হেঁটেছিল তাঁর শেষযাত্রার মিছিলে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেই তোরণের দু ধারে। চিতার আগুনে সঁপে দেওয়া হল সৌমিত্রকে। আগুনের স্পর্শে বিলীন হয়ে গেল তাঁর সুঠাম দীর্ঘ দেহ, চিরকালের জন্য হারিয়ে গেল সেই উদাত্ত কণ্ঠতন্ত্রী যে কণ্ঠে উচ্চারিত যে কোন কবিতার পংক্তি আমাদের অন্তরের গভীরতম অন্দরে গিয়ে প্রতিধ্বনি তুলেছে বরাবর, যাঁর অভিব্যক্তি যে কোন চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছে এতদিন, হারিয়ে গেল তাও।

এই সেদিন পর্যন্ত মৃত্যুকে তিন পাত্তি খেলার জন্য পাঠানো তাঁর দৃপ্ত আহ্বান আমরা সামাজিক মাধ্যমে ভাগ করে নিয়েছি নিজেদের মাঝে আর মনে মনে বিশ্বাস করতে চেয়েছি যে হোক তাঁর বয়েস, হোক তাঁর শরীরে মারণ রোগ মৃত্যুর সাথে তিন পাত্তি খেলায় তাঁরই জিত হবে। তিনি যে ফেলু মিত্তির, আমাদের আশৈশবের হীরো। কিন্তু তোপের আওয়াজে শোক স্তব্ধ জনতা যখন তাঁকে বিদায় জানাল, হৃদয়ের আবেগে উদ্বেল সেই মুহূর্তে সেই স্বতস্ফূর্ত জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে মনে হল আজ যিনি চলে গেলেন, তাঁর সত্যিকারের পরিচয় কি ?

তিনি শুধুই কি একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ বাঙালী অভিনেতা, যাকে সত্যজিৎ রায় বেছে নিয়ে নিজের হাতে গড়ে নিয়েছিলেন ? তাঁর চলে যাওয়ার পর তাঁর কথা যত ভাবছি, ততই মনে হচ্ছে যে শুধু অভিনেতা নয়, যিনি চলে গেলেন, তিনি ছিলেন সেই লোকটি, আমরা সবাই বাঙালী হিসাবে যা হয়ে উঠতে চেয়েছিলাম । প্রতিষ্ঠায়, মননে, নাট্যপ্রতিভায় অভিনয়ে, কাব্য চর্চ্চায় শিখর ছুঁয়েও তিনি সযত্নে পরিহার করেছিলেন জনমনোহারিনী আলোর হাতছানি, থেকে ছিলেন আদ্যন্ত বাঙালী । তাঁর মৃত্যুর পর ম্যাগসেসে পুরস্কার প্রাপ্ত হিন্দী সাংবাদিক রবীশকুমার, যিনি বাংলার জামাইও বটে এবং সেই সূত্রে প্রায়ই কলকাতায় এসে সময় কাটিয়ে যান, একটি সংবাদ সমীক্ষা করেন ও বলেন যে কোন শিল্পী বা সাহিত্যিকের মৃত্যুতে এই ধরণের শোকাপ্লুত অথচ ভাবগম্ভীর শোকপ্রকাশ একমাত্র বাংলা ও বাঙালীর কাছেই আশা করা যায় । ভারতের অন্য যে কোন প্রদেশে এ উপলক্ষ্যে হয় জাঁকজমক করে চোখধাঁধানো ঘটায় মিছিল বের হয়, অথবা এই ধরণের শিল্পীর মৃত্যুর সংবাদ খবরের কাগজের এক কোণায় বের হয়, সাধারণ মানুষ যা একবার পড়েই ভুলে যায় । সাধারণ বাঙালী কিন্তু শিল্প সাহিত্যকে নিজের অন্তরের মূল ধন ভাবে , তাই তারা শিল্পী সাহিত্যিকের মৃত্যুতে মর্মাহত হয় । এই শিল্প সাহিত্যর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি আর সংবেদনশীল অনুভূতিপ্রবণ মনই বোধহয় বাঙালী চরিত্রের নির্যাস ।

সৌমিত্র ছিলেন সেই বাঙালীয়ানার সার্থক প্রতিভূ। বাঙালী জীবনের পথে ঘাটে শহরে, গ্রামে ছড়িয়ে থাকা কুশীলবেদের তিনি দেখেছেন, বুঝেছেন, তুলে ধরেছেন আমাদের চোখের সামনে। তাঁকে এক কথায় বলা হত সত্যজিৎ রায়ের মানসপুত্র। কিন্তু আজ যেন চোখে পড়ছে সত্যজিতের হাতে তিনি তৈরী বটে কিন্তু তাঁর শিল্পী ও ব্যক্তি সত্ত্বা আরো বহুদূরে পরিব্যপ্ত। অপুর সংসারের অপুকে দিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল বটে এবং তারও পরে অমল, সন্দীপ, ফেলুদা নানাভাবে নানা চরিত্রে তিনি সত্যজিতের মানসপটে আঁকা গল্পের সার্থক রূপায়ণও করেছেন। কিন্তু এছাড়াও কীভাবে টুকরো টুকরো কত বাঙালী চরিত্রকে যে তিনি আমাদের কাছে এনে দিয়েছেন, ভেবে দেখছি আর আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। তাদের বেশীর ভাগকেই আমরা ভুলতে পারিনি। সমাপ্তির অমূল্য – সেই যে সুবোধ ছেলেটি কখনো হয়ে গিয়েছে বর্ণালী সিনেমার সাধারণ একটি যুবক, ভুল করে একটি বাড়ীতে নিমন্ত্রণ চিঠি দিতে গিয়ে যে সে বাড়ীর মেয়েটিকে ভালবাসে, আবার কখনো তিনভুবনের পারের রকবাজ বখা ছেলে, ভালবাসার পরশপাথরে যে অধ্যাপনা বেছে নেয়। এমনি কত

ঘটনা তো ভাবপ্রবণ দৈনন্দিন বাঙালী জীবনে ঘটেই থাকে। এরা কেউই একটিমাত্র বাঙালী ছেলে নয় । বাঙালী জীবনের নানান পথে হেঁটে যাওয়া আলাদা আলাদা বাঙালী যুবক। কারুর সাথে কারুকে মিলিয়ে ফেলা যায় না। প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র । কিন্তু যাকেই দেখি, সৌমিত্র তার সাথে একাকার হয়ে যান। একই অঙ্গে এত রূপ ছবিতে একটি বাগদত্তা মেয়ে গরীব ছেলেটিকে কথা দিয়ে তার জন্য অপেক্ষা না করে বাড়ীর চাপে অন্য একটি সুপাত্রের ঘরে চলে যাওয়ার পর সে ছেলেটি তার বাড়িতে গিয়ে তাকে বিয়ের আগে দেওয়া একসাথে আত্মহত্যার প্রতিশ্রুতির শর্ত মনে করিয়ে নিজের সাথে আত্মহত্যা করানোর জন্য চোয়াল শক্ত করে জেদ ধরে বসে থাকে – এ ছবিটি সৌমিত্রর জেদের ছবির সাথে এক হয়ে যায়। আবার "বাক্স বদল" এর তরুণ সাইকোলজিস্ট যে প্রেমে পড়ে গোঁফ কামিয়ে চেহারা পাল্টায়, আর "বসন্ত বিলাপ" এর ফাজিল তরুণ, "অশনি সঙ্কেত" এর গ্রাম্য পুরোহিত – এরা প্রত্যেকেই বিশ্বাসযাগ্য, কারণ বাঙালী জীবনে এদের সবাই কোথাও না কোথাও দেখা যায় । এই সব চরিত্র দেখাতে পেরেছেন সৌমিত্র কারণ এদের তিনি দেখেছেন বুঝেছেন ,নায়ক হয়ে দূর থেকে নয়, সাধারণ বাঙালী হয়ে কখনো কলেজ স্ট্রীট কফি হাউসে, কখনো নিউ মার্কেটে সন্তানদের ইস্কুলের পড়ার সাজ সরঞ্জাম নিয়ে ছুটে, কখনো কলেজ স্ট্রীট বইয়ের দোকান বা এটি এম এর লম্বা লাইনে সাধারণ মানুষ হয়ে সাধারণ মানুষের ভীড়ে দাঁড়িয়ে ।

তাঁর এই দেখা তিনি কবিতায় ধরে রেখেছেন,

"একজন সাধারণ লোক
আচমকা ছুটি হয়ে গেলে দুপুর বেলায়
বাড়ি ফেরবার থেকে ছুটি নিয়ে
এই ডোবা পুকুরের পাড়ে এসে বসে
হিসেবেই থেকে ছুটি নিয়ে
শীতের রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে আলস্যে বসে থাকে
.....
আজ এই সাধারণ দুপুর বেলাতে
পথে পথে ঘুরপাক দুঃখ থেকে ছুটি পেয়ে
বেচা কেনা করবার দুঃখ থেকে ছুটি হয়ে
ঘাড় গুঁজে কোমর ভাঙ্গবার দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে
শান্ত সুখে এই সাধারণ লোক
পুকুরের পাড়ে এসে যেমন বসেছে
তেমনই তো সুখে দুঃখে মিশ্র – আয়ুকাল
কাটাতেছে
কতই মানুষ –
সুখে যেন প্রতিবিম্বিত হয়ে অন্যের সুখের
দুঃখে স্বতন্ত্র হয়ে দুঃখিত হয়ে নিজেরই মতন
সাধারণ মানুষটি ভাবে
তবু দুঃখের মুখে
অপরিচিতের রহস্য কিছুটা তো থাকে
সব দুঃখ চেনা নয় – এমনকি দুঃখকে দুঃখ বলেও
চেনা যায় না তো কখনও।

সকলের মাঝে মিশে গিয়ে তাদের একজন হয়ে থাকাতেই তাঁর চিন্তন ও মননসার্থকতা গড়ে উঠেছে। সেই মনন রূপ পেয়েছে তাঁর অভিনয়ে –

"মানুষেরই সঙ্গে থাকা ভালো বলে
কেউ গিয়ে থাকেনা জঙ্গলে একা একা –
তুমি তাই এই উপনিবেশেই আছ।
আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েই নিজেকে
মানুষকে দ্যাখা হল ?
কত ঘৃণা এবং চাতুরি মানুষে সক্রিয় আজ
ক্রুর অক্ষুণ্ন হতে পারে মানুষেরা
মানুষের জুলুমে মানুষ কত প্রাপ্ত ক্লেশ ?"

এই জুলুমকে নানাভাব হয়তো তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তাই "চারুলতা"র নিষ্পাপ অমল থেকে অনায়াসে "ঝিন্দের বন্দী"র ক্রুর ষড়যন্ত্রকারী ময়ূরবাহন হয়ে উঠতে পেরেছেন, পেরেছেন হয়ে যেতে পাষন্ড পন্ডিতের মত লোভী ধূর্ত খল চরিত্র । আবার ঐ মানুষের মাঝে অন্তর্নিহিত যে স্বার্থপরতা, তাকে কাছ থেকে দেখতে পেয়ে ব্যথিত হয়ে বলেছেন যে, "বামপন্থাই একমাত্র বিকল্প।"

হয়তো সুদীর্ঘ জীবনের এই দেখাতে ক্লান্তি এসেছে কখনো, বলেছেন,

"ভোর তুমি ফিরো না এখানে
আমাকে ঘুমাতে দাও সারাদিন
আধবেলা – আরও কিছুক্ষণ –"
তাই কখনো বলেছেন
বৃষ্টিতে ভেজা বাতাস এসে
আমার বুকে হাত রাখতেই বুঝতে পারি
এইখানে স্পন্দন নেই
শুধু একটা গোঙানি জমাট বেঁধে আছে।

সেই সব দুঃখ কথা নিয়ে তিনি বারবার গড়েছেন নতুন নতুন চরিত্র। সে সব চরিত্র বেছে নিতে গিয়ে তিনি গ্ল্যামার খুঁজতেন বলে মনে হয় না। বরঞ্চ বোধহয় খুঁজে নিতেন চ্যালেঞ্জ। তাই উত্তম কুমার যখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে, তখনো তাঁর মত জনপ্রিয় নায়কের বিপরীতে অপরিচিত ছবিটিতে বুদ্ধিহীন বা জড়বুদ্ধি একটি যুবকের অভিনয় করতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বাঁধেনি। ঠিক একই ভাবে তিনি "স্ত্রী" ছবিতে সেই উত্তমকুমারের দাপুটে উচ্ছৃঙ্খল জমিদার চরিত্রের বিপরীতে সীতাপতির মত মিনমিনে আরেকটি চরিত্র করতেও পিছ পা হননি। এবং এই সব চ্যালেঞ্জ তিনি নিয়েছিলেন যখন বাংলা দেশের দর্শক তাঁদের দুজনের প্রতিযোগিতা নিয়ে তুমুল আলোচনা করে চলেছে । বয়স যখন ছায়া ফেলেছে তাঁর শরীরে সূর্য নামছে পশ্চিমে তখনও চরিত্র চিত্রণ তাঁর তেমনি বৈচিত্র্যময়। "বালিগঞ্জ কোর্ট" এর স্যার বীরেন, "পুনশ্চ" এর দিন অতিক্রান্ত বৃদ্ধ প্রেমিক, "বেলাশেষে" এর ক্লান্ত পথিক স্বামী, যে জীবন অপরাহ্নে এসেও আজীবনের সঙ্গীনিটিকে ফেলে রেখে ইউলিসিসের মত নতুন অভিজ্ঞতার সন্ধানে যেতে চায়, তার পর ঘুরে ফিরে নীড়ে ফিরে আসতে গিয়ে দেখে ঠিক যেখানটিতে সে আগে ছিল, সেটি আর তেমন নেই – এদের সবাইকেই হয়তো আমরা জীবনের বাঁকে

বাঁকে দেখেছি, কিন্তু আলাদা আলাদা করে নজর করে রাখিনি। সৌমিত্র যখন নিজে দেখে আমাদের দেখান তখন চমকে ভাবি, "ঠিক ঠিক । এরা সবাই আলাদা , এদের দেখেছি।"

তিনি যে বারে বারে ঘুরে ফিরে বাঙালী জীবনের পথ পরিক্রমা করেছেন, তার কথা ফুটেছে তাঁর লেখায়

"দুয়েকটা স্বপ্নের খোঁজে বের হওয়া যাক পুনরপি
জোগাড় কি হবে না আবার ?
প্রান্তরের থেকে আর পাদ পল্লব থেকে
বহুদিন পান করা গেছে যে আরক
স্বপ্ন উৎপাদনকারী মৃদু বিষক্রিয়া
এখন তাহাতে আর নাই।"

এমনি পথ হাঁটতে হাঁটতে তিনি বাঙালী জীবনে দেখা নিজের অভিজ্ঞতা আর অনুভূতি গুলির নির্যাস অনেক সময় খুঁজে পেয়েছেন ব্রেখট আর রিলকের লেখায়। অনুবাদ করেছেন অভিনয় করেছেন অন্য ভারতীয় ভাষার বা বিশ্বের অন্য ভাষার নাটক কে বাংলায় একেবারে বাঙালীর মনের মতন করে। দেশে পেয়েছেন দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার, সম্মানিত হয়েছেন পদ্মভূষণে, সংস্কৃতির লেফটন্যান্ট আর লিজঁ দ্য অনর এসেছে ফ্রান্স থেকে। এছাড়া নানান দেশের অন্যান্য বড় উৎসব থেকে আরো অজস্র পুরস্কার দেওয়া হয়েছে তাঁকে। তবু বলব যে হয়তো যতটা তাঁর পাওয়া উচিত ছিল, ততটা পাননি, কিন্তু সে জন্য কোনদিন কোন ক্ষোভ দেখাননি। নায়কের জাঁক জঁমক দাবী করেননি। গল্ফ গ্রিনের ছোট্ট বাসাটিতে সাধারণ জীবন কাটিয়েছেন। এইখানেই তিনি সার্থক বাঙালী – যে বাঙালী বিশ্বের সম্ভার আহরণ করে এনে নিজের অন্তর্জগত সমৃদ্ধ করেও একান্ত ভাবে বাঙালী হয়েই থাকে। আমরা সবাই সেই বাঙালীই তো হতে চেয়েছি, পারিনি। সৌমিত্র পেরেছিলেন – তাই তাঁর চলে যাওয়ার দিনে তোপ পড়ে, সাধারণ মানুষ চোখের জলে স্তব্ধ হয়ে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে – তিনি যেতে যেতে তাদের বাঙালী সত্ত্বাকে মনে পড়িয়ে দিয়ে যান।

যেতে যেতে হয়তো পিছন ফিরে আমাদের মনে করান যে নিশ্চয়তা আর অনিশ্চয়তায় মেশানো এই জীবনের আস্বাদই ধ্রুব । তাই যেতে যেতে বলে যান,

"মৃত্যু কোন নিশ্চয়তা নয় । যার চোখ বুজে গেল
এইমাত্র, ইলেকট্রিক চুল্লিতে যাবে ট্রের উপরেতে শুয়ে
তার মৃত্যু শুধু এক অনিশ্চয় অচেতনতায় ফিরে আসা
প্রথম যেদিন গর্ভ থেকে মুক্ত হয়ে নাড়ি কেটে
স্বতন্ত্র আয়ুর অধিকার পেয়েছিল এই লোক
সেদিনও তো চেতনার আলোক ছিল না। সেই অন্ধকারে
কি বা ছিল শবদাহ অন্তে কী বা আছে জানা নেই। .....
..... তারই মাঝখানে শুধু এ জীবন
ভেসে আছে আশ্চর্য দ্বীপের মতো সচেতন
সানুভব - বেঁচে আছি এই উল্লাসে স্ফূরিত।.....
.....

দেওয়া নেওয়া সিঁড়ির ভেঙে ওঠা উচ্চাশায় উন্মুখ

কত সব ভালবাসাবাসি থাকে, কত প্রেম সম্বন্ধ
আদতে দয়া ক্ষমা করুণা কি কৃতজ্ঞতা ছাড়া
কিছু নয়। তবু সেই সব সম্বন্ধ টেনে টেনে মানুষ
যে বাঁচে, কিসের আশায় ? কিসের আশায়
প্রতিদানহীন রয়ে তবু মরুগুল্মের মতো কাঁটার মুকুট
পরে বেঁচে থাকে কারও কারও ভালবাসা ?
সে কি শুধু প্রেমিকের মনে বেঁচে আছি এই সদর্থক
নিশ্চয়তা পায় বলে ? অথবা কি জীবনের
এই হল প্রথম স্বভাব, জীবিতের ধ্রুব আস্বাদ
এই অনিশ্চিত অন্ধকার কালক্রমে সুনিশ্চিতে আলোকের ?”

শঙ্খ ভৌমিক

উদয়ন পণ্ডিতকে লেখা ব্যক্তিগত মোনোলগ

বোধহয় কোন বিদ্বজন বলে গেছেন "Life imitates art far more than art imitates life"

– স্যার, একটু শুনবেন ?

জানি আপনি বৈতরণী পার হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন; হয়ত একটু উদ্‌গ্রীব হয়েই। ও পাড়ার আড্ডাটা স্বাভাবিক ভাবেই জমজমাটি; আপনার গুরু থেকে বন্ধু স্থানীয় বেশির ভাগই তো এখন ও পাড়ায়।

এই সময় বিরক্ত করছি বলে কিছু মনে করবেন না। আসলে ভেবেছিলাম আপনি তো প্রকৃত যোদ্ধা; এবারও টেনে দেবেন – মানে অক্সিজেন ট্যাঙ্কে আর নলের জটের তলা থেকে বেরিয়ে আসবেন, আর আমরাও খুশি মনে বাংলা সংস্কৃতি বেঁচে আছে, দিব্যি আছে ঘোষণা করে দিবানিদ্রা দেব। কিন্তু আপনি এই খেলাটা আর খেলতে চাইলেন না। তা এবার আমরা কি করবো, সেটা একটু দয়া করে বলে দিন না ?

জয়চন্ডী পাহড়ের তলায় আপনি যে টোল খুলেছিলেন, সেখানে ভর্তি হয়ে মন দিয়ে শিক্ষা লাভ করার চেষ্টা করেছিলাম। গায়ে চাদর জড়িয়ে আপনি যে হিতোপদেশ দিয়েছিলেন, মন দিয়ে শুনেছিলাম। সেই সময় দাঁড়িয়ে, আত্মস্থ করেছিলাম সেই কথাগুলো। তারপর টোল বন্ধ হল; আমরা কিন্তু আপনার পেছন ছাড়ি নি। টোল থেকে টোলে ঘুরেছি আপনার পেছন পেছন – শিক্ষাকে মূলধন করাই ছিল জীবনের মন্ত্র। আপনি বলেছিলেন ছায়াপথ থেকে প্রত্যয়, আত্মবিশ্বাসের আগুন টেনে এনে জ্ঞানের আলোয় পৃথিবী হীরকোজ্জ্বল হবে। সব কথা বুঝেছি যে তা নয়, কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই, আপনার কথা শুনে রোমাঞ্চ লেগেছিল। কি করে আপনি অনায়াসে এক চরিত্র থেকে অন্য চরিত্রে হেঁটে চলে যেতেন, পর্দা থেকে মঞ্চে – হতবাক হয়ে যেতাম।

ফিরে আসা যাক, যে কথা বলছিলাম। আপনি তো টোলে বললেন প্রকৃত শিক্ষা পেলে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে, রুখে দাঁড়াতে হবে। প্রয়োজন হলে "দড়ি ধরে টান মারতে হবে", যাতে অত্যাচারী রাজা খান্‌খান্ হয়। এইবার বলুন তো এর ফল কি হল ?

আপনার এই বৈপ্লবিক ডাকে সাড়া দিল কারা ? আমাদের মতন গুডি, গুডি ছেলেরা কি করল বলুন তো ? ভীতুরা যা করে থাকে – আচ্ছা কোন দড়ি , কত লম্বা দড়ি, কিসের দড়ি – নাইলন না চামড়া না নারকেল দড়ি, এইসব অযথা প্রশ্ন করতে করতে লাইনের শেষে দাঁড়ালাম। আর যে সব ডাকাবুকো ছেলেরা আপনার কথা আক্ষরিক অর্থে নিল এবং সোজা লাইনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো – কী হল তাদের এই বিশ্বাসের ? যা হয়, তাই হল। ওরা 'রাস্ট্রিকেট' হল; আপনি টোল গুটিয়ে চললেন। এরপর? আমরা হাফপ্যান্ট ছেড়ে ফুলপ্যান্ট ধরলাম; কিন্তু আপনার পেছন ছাড়ি নি। কিন্তু, এই ছেলেগুলো যাদের কৈশোর থেকে যৌবনের পথে খাদে ফেলে আমরা এগিয়ে গিয়েছিলাম, বা ভেবেছিলাম যে এই রেসে কিছু লোককে ফেলে আসা গেছে, তাদের যারা একেবারে অন্ধকারে মিশে যায় নি, খাবি খেতে খেতে উঠে দাঁড়িয়েছে একদিন আপনারই মুখে বন্দুক ঢুকিয়ে, আপনার চশমা খুলে নিয়ে বলল "মাষ্টারমশাই, আপনি কিছু দেখেন নি"। আপনি ঢোক গিললেন, প্রমাদ গুনলেন।

রেগে যাবেন না স্যার। আমি আপনাকে দোষারোপ করতে আসি নি। একে একে খসে পড়া তারা আর দেশের পালটে যাওয়া অর্থনীতি অনেককেই বোবা করে দিয়েছিল। আপনি রয়ে গেলেন বাঙালি রেনেসাঁর শেষ আইকন হিসাবে। আপনার ওপর হাজার ভোল্টের আলো সুতীব্র ভাবে প্রজ্জ্বলিত হল।

আমরা কিন্তু বেশ খুশীই হলাম। দেশের সেবা, জনস্বার্থে ত্যাগ, এগুলো কীরকম শোনাচ্ছিল যেন; মানে ওই রাজনীতি, রাজনীতি গোছের। ওসব আমাদের করতে বলবেন না। সেটা ছেড়ে ব্যক্তিগত অর্থনীতির ওপর ফোকাস্ করলাম। কিন্তু আপনার লেজুড় হয়ে থাকলাম। "আইকন" থেকে বিচ্ছুরিত আলোয় আলোকিত হওয়ার ইচ্ছে। তাই আপনার পেছন ছাড়লাম না। আমরা তখন স্লোগান ছেড়ে, আপনার পদপ্রান্তে বসে আপনার সব বাণী মন দিয়ে শুনেছি। আপনি চুটিয়ে ছবি, নাটক করছেন – আপনার প্রত্যেকটা শব্দ মূল্যবান রত্নের মতন লুফে নিচ্ছিলাম। আপনি বললেন অধ্যবসায়ের কথা, আপনি বললেন অনুশীলনের কথা, দিন রাত এক করে কঠোর পরিশ্রমের কথা। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত মহড়ায় পড়ে থাকতে হবে স্রেফ শেখার জন্য। আপনার আইডল শিশির ভাদুড়ির কথা বললেন, – নাটকে চরিত্র হয়ে ওঠার কথা বললেন ।

শুনতে ভাল লাগলেও, কথাগুলো একটু ভারি শোনালো। বুঝলাম, "মানে বই" থেকে টুকলি মেরে হবে না। এদিকে বাড়ি, অফিসে গঞ্জনা, বান্ধবী রেগে আগুন – সব মিলিয়ে খুঁজেছি "Path of least resistance"। এর মধ্যে নিয়ন আলো রঙ পাল্টালো আর আদরের নৌকা উড়ালপুল পেরিয়ে নিরুদ্দেশে মিলিয়ে গেল।

আর ...

আমার বন্ধু দীপাঞ্জন একদিন ডানকুনি লোকালে করে আর ফিরল না।

ওইভাবে তাকাবেন না। আসলে এটাই বলার ছিল; যার জন্য এতটা সময় নষ্ট করলাম। দীপাঞ্জন নাট্যকর্মী ছিল, প্রকৃত শিল্পী ছিল; আপনার কথা অক্ষরে, অক্ষরে পালন করেছিল। ওর সঙ্গেই দেখেছিলাম আপনার নাটক নীলকণ্ঠ, বিদেহী, ফেরা, নাম জীবন টিকটিকি, আত্মকথা ... ওই আমায় থিয়েটারের অ,আ শিখিয়েছিল।

কিন্তু ভাল ছাত্র হওয়ার সুবাদে ও ছোটবেলায় পড়া ভুলে যায় নি – দড়িটার কথা মনে ছিল; টেনেওছিল – সিলিং ফ্যানে ঝুলিয়ে –

আমরা কেউ কেউ ভাল ছাত্র হতে পারি নি; আমাদের মধ্যমেধা মধ্যবয়সে এসে মধ্যপন্থায় আপোষ করেছে; কিন্তু এইটুকু বলার ছিল যে কেউ কেউ আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল।

আপনার নাও এসে গেছে; কীর্তন শুনতে শুনতে আপনি বৈতরণী পেরিয়ে পৌঁছে যাবেন নিশ্চই অন্য পারে। ভাল থাকবেন স্যার, ভাল থাকবেন উদয়ন পণ্ডিত।

সিদ্ধার্থ দে

মণিকাঞ্চন যোগ : সত্যজিৎ সৌমিত্র

জন্ম আমার শ্যামবাজারে। একেবারে সেই বিখ্যাত পাঁচ মাথার মোড়ে যেখানে বিশ্রী একটা নেতাজির মূর্তি আছে, সেখান থেকে বড় জোড় একশ গজ দূরে একটা নার্সিংহোমে।

আমার প্রথম স্মৃতি ষাটের দশকের শুরুতে। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে (এখন যেটা বিধান সরণী) লাইন দিয়ে অনেকগুলি সিনেমাহল ছিল – দর্পনা, মিত্রা, মিনার, উত্তরা, রাধা, রূপবাণী এবং আরো কয়েকটি। সবগুলির নাম আজ আর মনে নেই। বাড়ীতে মা বাবা ছাড়াও থাকতেন ঠাকুমা ও দুই পিসি। দাদাকে কিছু কারণে পুরুলিয়াতে হস্টেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যার ফলে বাড়ীতে আমি ছিলাম একেবারেই সঙ্গহীন। সেইজন্যই বাড়ীর বড়রা সিনেমা দেখতে গেলে আমিও বায়না ধরতাম সঙ্গে যাবার। সেই কারণেই ছ-সাত বছর বয়স থেকেই আমার সিনেমা দেখার শুরু।

****

দিদি (ঠাকুমাকে এই নামেই ডাকতাম) প্রায়ই সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালি' ছবিটির কথা বলতেন। আমার জন্মের বছরে (১৯৫৫) মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিটি রীতিমত জনপ্রিয় হয়েছিল। কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালি' পড়ার বা বোঝার বয়স তখনো হয়নি। দিদির কাছেই হরিহর-সর্বজয়া-অপু-দুর্গার টুকরো টুকরো গল্প শুনে মনে মনে একটা ছবি এঁকেছিলাম। তখন বাড়ীতে 'যুগান্তর' দৈনিক আসত। যতদূর মনে পড়ে চার নম্বর পাতাতে চালু ছবিগুলির বিজ্ঞাপন থাকত। একদিন দেখলাম মানিকতলায় 'ছায়া' নামে হলে রবিবারের মর্নিং শো-তো পথের পাঁচালি দেখাচ্ছে। দিদির সঙ্গে দেখতে গেলাম। সেই আমার চিত্র পরিচালক সত্যজিতের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। সালটা ১৯৬৩ বা ৬৪।

****

মিথ্যে বলব না, সেই আট-ন বছর বয়সে বিশ্ববিখ্যাত ছবিটি আমার সেরকম কিছু ভাল লাগেনি। সেটা সত্যজিতের পরিচালনার ত্রুটির জন্য অবশ্যই নয়। ঐ রকম একটি ছবি ন'বছরের বালকের বোঝার কথা নয়। বিশেষ কিছুই বুঝিনি। কেবল দুর্গার মৃত্যুর দৃশ্যটি বেশ নাড়া দিয়েছিল। কোন নিকটাত্মীয়ের মৃত্যু তখনও আমার জীবনে ঘটেনি। সিনেমার পর্দায় হলেও একটি বালিকার মৃত্যু দৃশ্য দেখে বড় কষ্ট হয়েছিল।

বেশ অল্প বয়স থেকেই বই পড়া শুরু করেছিলাম। বিভূতিভূষণের কয়েকটি উপন্যাস বাড়ীতে ছিল। আরণ্যক, পথের পাঁচালী আর চাঁদের পাহাড় পড়েছিলাম। বলাই বাহুল্য, 'চাঁদের পাহাড়' সবচেয়ে বেশী উপভোগ করেছিলাম বইটি কৈশোর ছুঁই ছুঁই বালকদের উপযোগী হবার কারণে।

পরবর্তী জীবনে 'পথের পাঁচালী' অগুন্তিবার দেখেছি। ছবিটি তৈরীর অনেক নেপথ্য কাহিনীও শুনেছি। ছবিটির শুটিং অর্থের অভাবে নাকি মাঝপথে আটকে ছিল। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় কিছু সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করায় সত্যজিৎ ছবিটি শেষ করতে সক্ষম হন।

পরিণত বয়সে দেখার পর উপলব্ধি হয় কেন সারা বিশ্বে ছবিটি এত সমাদৃত হয়েছিল। যথার্থই একটা ক্লাসিক। এই ছবি নিয়ে গত ৬৫ বছর ধরে দেশবিদেশের অনেক বোদ্ধা লিখেছেন। আমার সামান্য জ্ঞান নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আর কিছু লিখলাম না।

****

সৌমিত্র চট্টাপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের সঙ্গে একটা মজার গল্প জড়িয়ে আছে।

নতুনপিসীর সঙ্গে পাড়ার কোন হলে একটা বাংলা ছবি দেখতে গেছি। অজয় কর পরিচালিত ১৯৬৩ সালের ছবিটির নাম 'বর্ণালী'। তার মানে সেই সময়ে আমার বয়স আট। নায়ক সৌমিত্র, নায়িকা (আয়েষা বেগম হওয়ার আগের) শর্মিলা ঠাকুর। রীতিমত সিরিয়াস প্রেমের ছবি।

একটা টানটান দৃশ্য। নায়ক -নায়িকা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। দুজনেই আবেগে নির্বাক। সারা হল নিস্তব্ধ। মাটিতে পিন পড়লে শোনা যাবে। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা বাচ্চা ছেলে পিসিকে জিজ্ঞেস করল "কী হল গো ?" সারা হলে হাল্কা হাসির রোল উঠল। ছবি চলাকালীন কিচ্ছু বুঝতে না পারা শিশুটি আরো বার দুয়েক এই প্রশ্নটি করেছিল। ছবির শেষে বেশ কয়েকজন দর্শক বাচ্চাটির গাল টিপে আদর করে যায়। দিনকাল তখন অনেক সহজ সরল অন্যরকম ছিল।

****

এই সৌমিত্র-শর্মিলা জুটির প্রথম ছবি সত্যজিতের অপুর সংসার (১৯৫৯)। দুজনেরই এটি প্রথম ছবি।

পথের পাঁচালীর সাফল্যের পর সত্যজিৎ 'অপরাজিত' ছবিতে সদ্য যুবক অপুর চরিত্রের জন্য অভিনেতা খুঁজছিলেন। সত্যজিতের পরিচিত এক ভদ্রলোকের সৌমিত্রকে পছন্দ হয় এই অপ্রত্যাশিত সুযোগে আপ্লুত সৌমিত্র কালবিলম্ব না করে সত্যজিতের সঙ্গে দেখা করেন। সত্যজিতের পছন্দ হলেও অপরাজিত ছবিতে ওনাকে নেননি কারণ সেই সময়ে দীর্ঘদেহী সৌমিত্র বাইশ বছরের পূর্ণ যুবক। কাহিনির অপুর জীবনের সেই পর্যায়ের নিরিখে বয়সটা একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল।

সৌমিত্র অবশ্যই বেশ আশাহত হয়েছিলেন। আসলে সত্যজিৎ এই সুদর্শন যুবককে দেখেই ঠিক করে ফেলেছিলেন অপু ট্রিলজির শেষ ছবি অপুর সংসারের অপু হবেন সৌমিত্র। যদিও মুখে কিছু বলেননি সৌমিত্রকে।

****

তর্কাতীত ভাবে বাংলা ছবির কালজয়ী নায়ক-নায়িকা জুটি উত্তম-সুচিত্রা। সঙ্গীত পরিচালক-গায়ক জুটি হিসাবে নাম করতে হয় সলিল-হেমন্তর। আর চিত্র পরিচালক-অভিনেতা জুটি বলতেই মনে আসে সত্যজিৎ-সৌমিত্র। সত্যজিতের ২৯টি পূর্ণ দৈর্ঘের বাংলা ছবির (তথ্যচিত্র বা পিকুর মত শর্ট ফিল্ম বাদে) মধ্যে ১৪টিতে নায়ক বা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সৌমিত্র।

একটি সাক্ষাৎকারে সৌমিত্রকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ওনার সেরা দশটি ছবির নাম করতে। ওনার অভিনীত দ্বিশতাধিক ছবির মধ্যে দশটি ছবি বাছা সহজ কথা নয়। প্রশ্নের উত্তরে উনি বলেছিলেন যে সত্যজিৎ পরিচালিত ছবিগুলি তালিকার বাইরে রাখবেন। কারণটা আর কিছুই নয় – ওনার অভিনয় জীবনের সেরা ১৪টি ছবিই সেই প্রবাদপ্রতিম পরিচালকটির সাথে।

এই লেখার সিনেমা সম্পর্কিত বাকী অংশ সত্যজিৎ-সৌমিত্র যুগলবন্দীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব। এই স্বল্প পরিসরে সৌমিত্র অভিনীত শতাধিক মূলধারার এবং ভিন্নধর্মী আইকনিক ছবির বিষয়ে আলোচনা সম্ভব নয়।

****

সত্যজিতের পরিচালিত, সৌমিত্র অভিনীত ছবিগুলির একটা কালানুক্রমিক তালিকা দিলাম:

অপুর সংসার (১৯৫৯)

দেবী (১৯৬০)

তিনকন্যা – (সমাপ্তি) (১৯৬১)

অভিযান (১৯৬২)

চারুলতা (১৯৬৪)

কাপুরুষ (১৯৬৫)

অরণ্যের দিনরাত্রি (১৯৬৯)

অশনি সংকেত (১৯৭৩)

সোনার কেল্লা (১৯৭৪)

জয় বাবা ফেলুনাথ (১৯৭৯)

হীরক রাজার দেশে (১৯৮০)

ঘরে বাইরে (১৯৮৪)

গণশত্রু (১৯৮৯)

শাখাপ্রশাখা (১৯৯০)

সব কটি ছবিই আমার দেখা। বেশ কয়েকটি একাধিকবার। ১৯৫৯ সালে সাদা কালোর যুগে ২৪ বছরের টগবগে চটকদার চেহারার এক আনকোরা তরুণের সঙ্গে যুগলবন্দীর শুরু। শেষ ১৯৯০ সালে এক কিংবদন্তিসম প্রৌঢ় অভিনেতার সাথে। মাঝে অনেক কিছু পাল্টে গেছে। পাল্টেছেন সত্যজিৎ, সৌমিত্র দুজনেই। বদলেছে প্রযুক্তি, সমাজ, মূল্যবোধ। যাবার আগের শেষ ছবি 'শাখাপ্রশাখা' যেন নানা রকম অবক্ষয়ের জন্য সত্যজিতের একটা দীর্ঘশ্বাস।

একটা ব্যাপার লক্ষণীয়, তা হল সৌমিত্রকে দিয়ে করানো চরিত্রগুলির বৈচিত্র্য। ফেলুদা রূপে দুটি ছবি বাদ দিয়ে কোন চরিত্রই এক ছাঁচের নয়। কোন ছবিতেই সেইভাবে রোমান্টিক নায়কের ভূমিকা ছিল না সৌমিত্রর । বেশ কয়েকটি ছবি তো প্রায় নারীচরিত্র বর্জিত হয়েও সফল! এখানেই সত্যজিতের মুন্সীয়ানা!

আলাদা করে ছবিগুলির উল্লেখ করলে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। পাঠক আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে চরিত্রগুলিকে স্মরণ করুন।

****

চিত্রাভিনেতা সৌমিত্র, পরিচালক সত্যজিৎকে নিয়ে কিছু আলোচনা করলাম। এঁদের প্রতিভা কিন্তু একমুখী নয়। 'সিনেমা'র বাইরে এঁদের জীবন, কাজ নিয়ে কিছু কথা বলব লেখায় ইতি টানার আগে।

****

বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে রায় পরিবারের অবদান অপরিসীম। উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার, লীলা মজুমদার, পূণ্যলতা চক্রবর্তী, নলিনী দাস, সারদারঞ্জন , সত্যজিৎ ... একটি পরিবার থেকে একঝাঁক মানুষ সাহিত্যের নানা ধারায়, সঙ্গীতে, অঙ্কনশিল্পে এবং চলচ্চিত্র জগতে বাঙলার সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে শতাধিক বছর ধরে। এই পরিবারের

অবদান ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তুলনীয় বললে মনে হয় অত্যুক্তি হবে না। সত্যজিৎ পুত্র সন্দীপও চিত্রপরিচালক রূপে সুপরিচিত।

সত্যজিৎ মাত্র দু বছর বয়সে বিরল প্রতিভাশালী পিতা সুকুমারকে হারিয়েছেন। বাবাকে কাছে না পেলেও বংশের ধারা সময়মত জানান দিয়েছে তাঁর নানা সৃষ্টিতে।

রায় পরিবারের মত অত পরিচিতি না থাকলেও কৃষ্ণনগরের চট্টোপাধ্যায় পরিবারের অনেকেই সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন নানাভাবে। সৌমিত্রর ঠাকুরদা ও পিতা দুজনেই নাটক ও আবৃত্তিতে উৎসাহী ছিলেন। বাড়িতে সাহিত্যপাঠের পরিবেশ ছিল। (সৌমিত্রর পিতা মোহিতবাবু কাজী নজরুল ইসলামকে 'নরুদা' বলে ডাকতেন।) ওনাদের কৃষ্ণনগরের বাড়িতে সুভাষচন্দ্র, অ্যানি বেসান্ত, সরোজিনী নাইডু মত বিশিষ্ট মানুষ একাধিকবার এসেছেন। গায়িকা সুচিত্রা মিত্রর সঙ্গে নিকট আত্মীয়তা চট্টোপাধ্যায় পরিবারের। আর সৌমিত্রর পিসির বিয়ে হয়েছিল স্যার আশুতোষের পুত্রের সঙ্গে। স্যার আশুতোষের বিশাল লাইব্রেরীতে অনেক সময় কাটিয়েছেন বালক সৌমিত্র। সব মিলিয়ে সত্যজিতের মতই একটা সুন্দর সাংস্কৃতিক পরিবেশে বড় হয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

****

ছোটবেলায় মা 'সন্দেশ' নামে মাসিক পত্রিকাটির গ্রাহক করিয়ে দিয়েছিলেন। সম্পাদক ছিলেন সত্যজিৎ এবং লীলা মজুমদার। তখনও জানতাম না যে উনি বিখ্যাত চিত্র পরিচালক। আসলে চিত্র পরিচালনা ব্যাপারটা যে কী সে বিষয়েই কোন ধারণা ছিলনা।

তবে উঁচুমানের পত্রিকাটির গল্পগুলি গিলতাম। মাঝে মাঝে 'হাত পাকাবার আসর' নামে ছোটদের লেখার একটি বিভাগে গল্প পাঠাতাম ডাকে। কয়েকটি লেখা মনোনীতও হয়েছিল। একটি সংখ্যায় আমার লেখার পাশে সন্দীপ রায়ের লেখা ছিল। যদিও সে সময়ে জানতাম না যে সন্দীপ সত্যজিতের পুত্র।

সত্যজিতের গপ্পোগুলি গোগ্রাসে পড়তাম। 'সেপ্টোপাসের ক্ষিদে', 'অনাথবাবুর ভয়', 'টেরোড্যাক্টিলের ডিম' – ছেলেবেলায় মুগ্ধ করা গল্পগুলি এই বয়সেও পড়ি। সেদিন এক সান্ধ্য আসরে একজন একটি তর্কসাপেক্ষ মন্তব্য করলেন – সত্যজিতের লেখা ওনার পরিচালনার চেয়েও উৎকৃষ্ট মানের।

এই ব্যাপারেও সৌমিত্রর সঙ্গে মিল। অভিনয়ের ফাঁকে উনি অজস্র কবিতা লিখেছেন। কবিতা পড়ার অভ্যেস নেই – তাই সৌমিত্রর কবিতা সেভাবে পড়া হয়ে ওঠেনি। তাই ওনার কবিতার বিষয়ে কোন অভিমত দিতে পারব না। তবে সেদিন এক পত্রিকায় পড়ছিলাম বন্ধু শক্তি চট্টোপাধ্যায় নাকি কোন সময়ে বলেছিলেন সৌমিত্র আগে কবি, পরে অভিনেতা। এর চেয়ে বড় certificate হয়না। যাইহোক, উনিই বোধহয় টলিউডের একমাত্র অভিনেতা যাঁর কবিতা সমগ্র প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা লেখা ছাড়া সৌমিত্র প্রবন্ধকার এবং নাট্যকার হিসাবেও সুনাম অর্জন করেছিলেন।

সত্যজিতের মত সৌমিত্রও পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। বন্ধু নির্মাল্য আচার্যের সঙ্গে 'এক্ষণ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সৌমিত্র। সত্যজিৎ পত্রিকাটির বেশ কয়েকটি প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন যতদূর জানি।

****

উত্তমকুমার সযত্নে নিজের larger than life ইমেজটা বজায় রাখতেন নিজেকে লোকচক্ষুর আড়ালে রেখে। সৌমিত্র কিন্তু সেভাবে স্টারডমের পিছনে ছোটেন নি। রাস্তাঘাটে, সভা সমিতিতে তাঁকে দেখা যেত। আমি ওনাকে একবার কফি হাউসে দেখেছিলাম সত্তরের দশকে – ছবির পর্দার চেয়েও রূপবান লেগেছিল।

দেশে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সৌমিত্র কতটা সহজভাবে মিশতেন জানিনা। ভালবাসার অত্যাচার এড়াতে মনে হয় কিছুটা আড়াল রাখতে হয় সেলিব্রিটিদের। মিলন ভট্টাচার্যর আমন্ত্রণে উনি ক্যানবেরাতেএসেছিলেন একবার – অল্পক্ষণের জন্য মাল্টিকালচারাল ফেস্টিভালে বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের স্টলেও ঢুঁ মেরেছিলেন। বেশ স্বচ্ছন্দভাবে কথা বলছিলেন স্থানীয় বাঙালীদের সঙ্গে।

সত্যজিৎকেও পথে ঘাটে দেখা যেত। তবে যেরকম প্রবল ব্যক্তিত্ব মনে হয় অপরিচিত মানুষজন আলাপ করতে দ্বিধা বোধ করতেন।

বছর এগারো বয়সে গরমের ছুটিতে দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছিলাম বাড়ীর সঙ্গে – বার কয়েক ছ' ফুট চার' ইঞ্চি মহীরূহটিকে (সৌমিত্র ছিলেন পাঁচ ফুট সাড়ে এগার ইঞ্চি) ম্যালে ঘুরতে দেখেছি। আর একবার এক শীতের মোলায়েম দুপুরে ওনাকে এসপ্ল্যানেডে দেখেছিলাম ফুটপাথে পসরা সাজিয়ে বসা এক বেদের কাছ থেকে কিছু বিদঘুটে জিনিস কিনতে – হয়তো কোন ছবির প্রয়োজনে। সত্যজিৎকে traditional sense-এ রূপবান বলা যাবে না – কিন্তু সব মিলিয়ে এই tall, dark, handsome মানুষটির চেহারায় বেশ একটা অন্যরকম আবেদন ছিল। কোথাও যেন একটা X-factor ছিল। ইদানীং দেখি অনেক চিত্র পরিচালক ছোটখাট রোলে অভিনয়ও করেন। সত্যজিৎকে অবশ্য কখনো ক্যামেরার সামনে দেখিনি কোন সিনেমায়। তবে আমার বিশ্বাস নায়ক হিসাবেও ওনাকে নেহাত মন্দ মানাত না!

****

একটা ব্যাপার জীবনে বহুবার উপলব্ধি হয়েছে। বিধাতা কিছু মানুষকে উজাড় করে দেন। বড় বেশীই যেন দেন। এই দুই মহারথীর নানা গুণের পর্যালাচনা করতে গিয়ে সেই কথাটাই ফের মনে এলো।

সিনেমায় অবদান ছাড়াও দুজনের সাহিত্যে ও সম্পাদনায় অবদান নিয়ে কিছু আলোচনা করেছি।

'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবির গানগুলি মনে পড়ে ? গানের কথা এবং সুর দুটোই পরিচালক মশায়ের। ছবির সঙ্গীত পরিচালনা নিজেই করতেন। সমস্ত ছবির চিত্রনাট্যও নিজেই লিখতেন। নিজের গল্পের অলঙ্করণে নীচের ডান দিকের কোণে ছোট্ট করে শিল্পীর নামটা লেখা থাকত। খুব ভাল আলোকচিত্রশিল্পীও ছিলেন। তিনি গীতিকার, সুরকার, সঙ্গীত পরিচালক, আর্টিস্ট, ফোটোগ্রাফার, চিত্রনাট্যকার। এছাড়া ইংরেজী বাংলা দুটি ভাষাতেই সুবক্তা। ভারী কণ্ঠস্বর সম্ভ্রম জাগানো। সব মিলিয়ে এক বিস্ময়কর প্রতিভা।

সৌমিত্রও গুরুর সঙ্গে ভালরকম টক্কর দেন গুণের বিস্তারে। বড় পর্দায় অভিনয়ের সাথে সাথে আজীবন মঞ্চে অভিনয়ও করে গেছেন। অভিনয়ের বিশেষ কিছুই বুঝিনা। তা সত্ত্বেও সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে আন্দাজ করতে পারি সিনেমায় অভিনয়ের তুলনায় স্টেজে অভিনয় অপেক্ষাকৃত কঠিন । পরিশ্রমের কাজও বটে। মৃত্যুর অল্পকিছুদিন পূর্বেও থিয়েটারে অভিনয় করেছেন চিরনবীন এই আইকন।

বাকী রইল কী? অনেক কিছুই। ওনার আবৃত্তি শুনেছি বেশ কিছু। কণ্ঠস্বরের ওঠানামায়, দীর্ঘ কবিতা মুখস্থ রাখাতে ... সবকিছুতেই স্বকীয়তার ছাপ।

একটা কথা হয়তো অনেকেই জানেন না। সৌমিত্র বেশ ভাল হকি খেলোয়াড় ছিলেন, কলকাতার ময়দানে দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলেছেন। খেলাধূলায় উৎসাহী মানুষটি বিয়েও করেছেন সেই সময়ের রাজ্য ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন দীপা দেবীকে। বিখ্যাত ফুটবলার প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।

****

সত্যজিৎকে নিয়ে ওনার জীবনকালে এবং মৃত্যুর পরে নানা ভাষায় বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। এখনো হয়ে চলেছে। সৌমিত্রর প্রয়াণের পরও সামাজিক এবং ছাপা মাধ্যমে সৌমিত্রর বিষয়ে অসংখ্য নিবন্ধ পড়লাম। এঁদের কারোর সঙ্গেই ব্যক্তিগত পরিচয় ছিলনা – কোন চমকপ্রদ তথ্য দেবার রসদ আমার নেই। এই লেখা কেবল ছড়ানো ছেটানো তথ্য দিয়ে গাঁথা এক গুণগ্রাহীর শ্রদ্ধার্ঘ মাত্র।

একে একে সবসময়ে দুই হয়না। দুই অনন্য প্রতিভার সমন্বয়ে যোগফলটিও অঙ্কের হিসাব মানেনা। সমষ্টির উৎকর্ষ অংশগুলিকে ছাপিয়ে যায়। সত্যজিৎ-সৌমিত্রর যুগলবন্দী এক বিরল মণিকাঞ্চন যোগ – এক প্রজন্মে দু'একটির বেশী দেখা যায়না।

সত্যজিতের ছবিগুলির দুটি প্রায় সমান বিভাজন করা যায় – সৌমিত্র অভিনীত আর সৌমিত্র ছাড়া। সৌমিত্রর একষট্টি বছরের অভিনয়জীবনের বালুতটেও একটা বিভাজন রেখা টানা যায় – সত্যজিৎ যুগ আর সত্যজিৎ পরবর্তী যুগ। দ্বিতীয় পর্বে আমরা পেয়েছি চরিত্রাভিনেতা সৌমিত্রকে – বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে যেন পূর্ণযৌবনের সৌমিত্রকেও ছাপিয়ে গেছেন অভিনয়ের দাপটে। 'বেলাশেষে' পৌঁছেও আমাদের 'শ্রাবণের ধারা'য় সিঞ্চিত করেছেন।

****

মৃত্যু মনুষ্যজীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। মন না চাইলেও এই সুন্দর পৃথিবীটাকে ছেড়ে যেতে হয় – প্রিয় মানুষদের চিরবিদায় মেনে নিতে হয়।

সত্যজিৎ ১৯৯২ তে চলে গেছেন। ২০২০তে প্রিয় শিষ্যও চলে গেলেন পরিণত বয়সে। একক এবং যৌথভাবে আমাদের মত অনুরাগীদের জন্য রেখে গেলেন অনেক মণিমুক্তা । আমাদের মধ্যেই তাঁরা থাকবেন। আরো অনেকদিন।

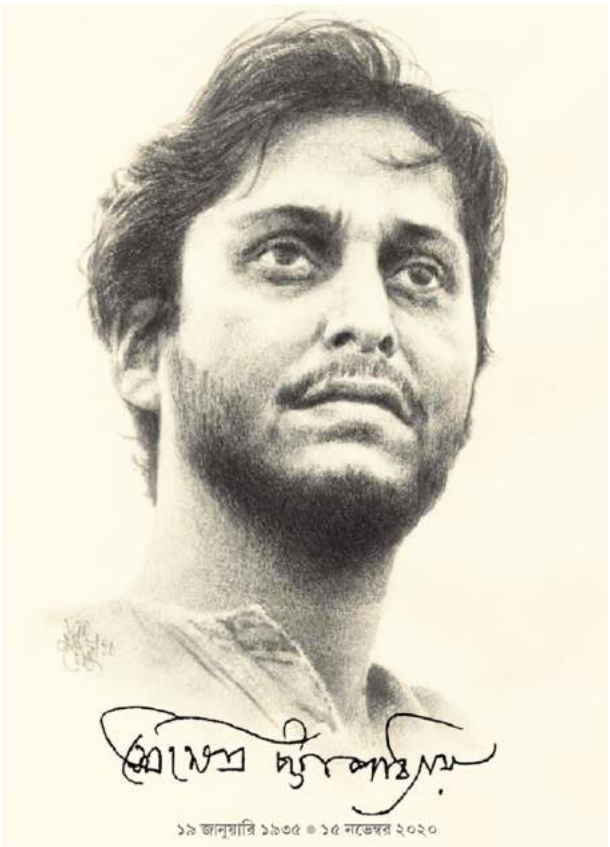

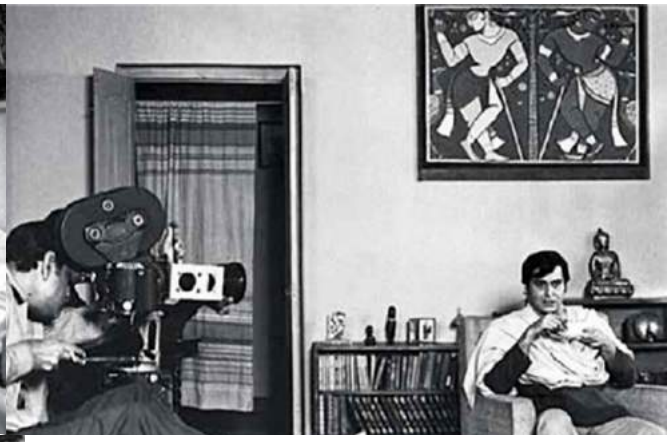

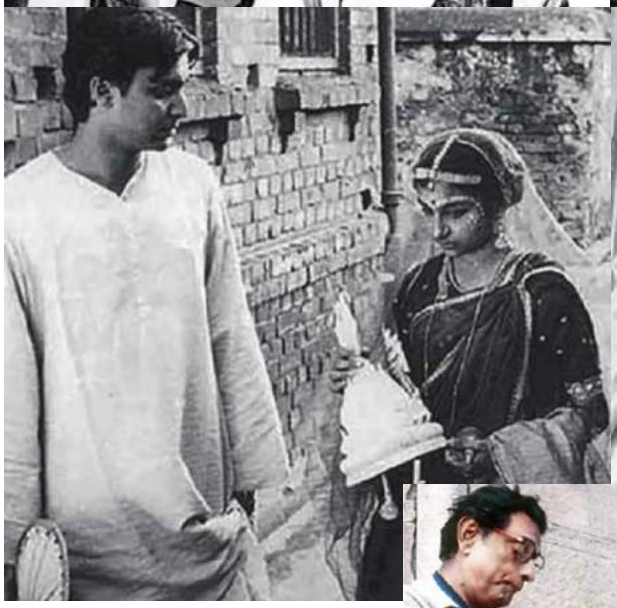
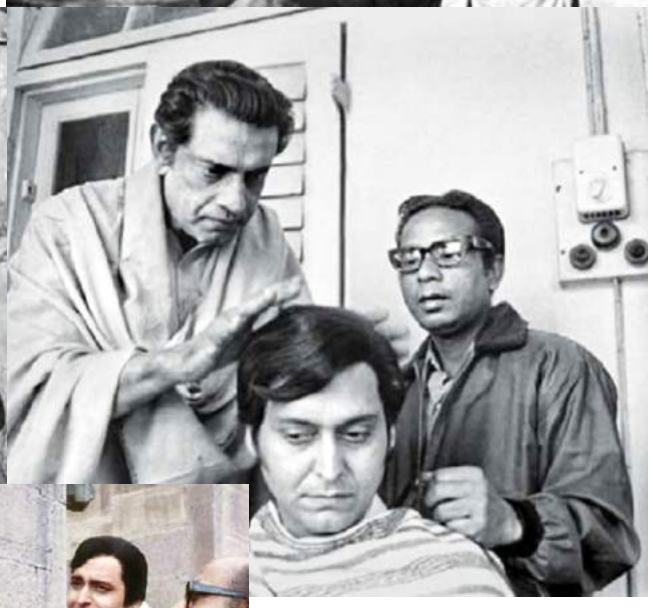
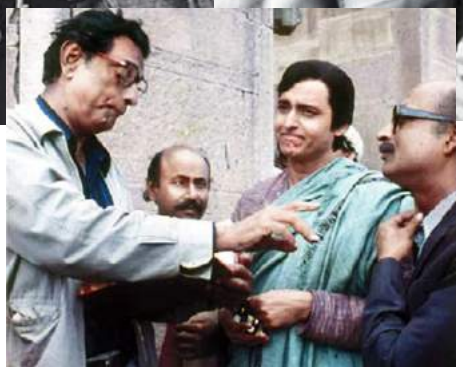

শ্রাবণী রায় আকিলা

স্মৃতিতে সত্যজিৎ, হৃদয়ে ফেলুদা

সত্যজিৎ রায়। মানুষটির মতই তাঁর ব্যাপ্তি ও ব্যক্তিত্ব আজও দীর্ঘ। এখনকার একেবারে নবীন প্রজন্মের থেকে আমরা একটু সৌভাগ্যবান ছিলাম কারণ আমাদের ছোটবেলায় বা বড় হয়ে ওঠার যে সময়টা, সেসময় উনি স্বমহিমায় লেখার এবং সিনেমা পরিচালনার কাজ করে চলেছেন। যদিও চুরাশি পঁচাশি সাল নাগাদই বোধহয় শারীরিক কারণে পরবর্তী বেশ কয়েক বছরের জন্য ওঁর সিনেমা পরিচালনার কাজে ছেদ পড়ে। তবে আমরা রেডিও, টিভিতে প্রায়ই তাঁর সাক্ষাৎকার শুনতে পেতাম। ওঁনার ওপর তৈরী বেশ কয়েকটি ডকুমেন্টরিও স্কুলে পড়াকালীনই টিভিতে দেখেছি বলে মনে আছে।

সত্তরের দশকের বেশিরভাগ বাচ্চার মতোই আমারও সত্যজিৎ রায়কে প্রথম চেনা 'সোনার কেল্লা' সিনেমার মাধ্যমে। মূল বইটি যদিও আর একটু বড় হয়ে পড়েছি ক্লাস ফাইভ সিক্স নাগাদ। সোনার কেল্লা সিনেমার একটি মজার স্মৃতি আছে আমার কাছে। আমার বছর সাত আট বয়েসে মায়ের কাছে শুনেছিলাম সিনেমাটি রিলিজ করে চুয়াত্তর সালে। আমি তখন নিতান্তই শিশু এবং আমাকে বাবার কাছে রেখে মা আর দিদি বাড়ীর আরো কারোর কারোর সঙ্গে সোনার কেল্লা দেখতে গিয়েছিল। আর তখন আমার দিদিও এত ছোট যে সে নাকি মন্দার বোসকে পর্দায় দেখে ভয়ে কেঁদে ভাসিয়েছিল। তা যাই হোক একটু জ্ঞানগম্যি এবং বয়স বেড়ে যাওয়ার পরে আমরা দুই বোনই সোনার কেল্লার গল্প সিনেমায় মজেছিলাম একসঙ্গে। সোনার কেল্লার বাইরে সত্যজিৎ রায়কে এরপরে কতটা এবং কিভাবে চিনলাম তার গল্প বলার আগে একটু অপ্রাসঙ্গিক শোনালেও প্রথমে আমার মায়ের কথা আমাকে বলতেই হবে।

আমার জন্ম, বড় হওয়া কলকাতায় নয়। তাই চারপাশে যে বিপুল শিল্প সাহিত্যের অনুকূল পরিবেশ অবলীলায় পাওয়ার সুযোগ ছিল তা নয়। ইস্কো কোম্পানিতে বাবার চাকরিসূত্রে আমার শহর ছিল বার্ণপুর। মধ্যবিত্ত সাধারণ পরিবেশ। কাঠখোট্টা শহর এবং অবাঙালি অধ্যুষিত। তবে সে শহরে ইস্কোরই পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীভবন নামে একটি দুর্দান্ত সাংস্কৃতিক মঞ্চ ও প্রতিষ্ঠান ছিল। সেই প্রতিষ্ঠানের এক ছাদের তলায় একটি উচ্চমানের লাইব্রেরি এবং বছরভর বিশেষত গোটা শীতকাল জুড়ে ভালো ভালো সিনেমা, ভালো সাহিত্য আলোচনা, আর্ট একজিবিশন, মার্গ সঙ্গীতের কনসার্ট সব কিছু দেখা ও শোনার সুযোগ পাওয়া যেত। কলকাতার সমস্ত বিশিষ্ট শিল্পী সাহিত্যিকদের ভারতীভবনে নিত্য আনাগোনা ছিল। সেই সঙ্গে আমার মায়ের নিরলস এবং একনিষ্ঠ চেষ্টা ছিল খুব ছোট্ট বয়েস থেকে আমাদের মধ্যে একটি বিশেষ রুচি, বোধ ও মননের বীজ রোপণ ও লালন করানোর। সেটা মা খুব বিশ্বাসের সাথে দ্বিধাহীন ভাবে করতো। খুবই ছোট বয়েস থেকে নানান সাহিত্য সম্মেলনে, সাহিত্য আলোচনা, ভালো থিয়েটার, মূকাভিনয়, চোখ কচলে সারারাতব্যাপী রাগসঙ্গীতের আসরে গিয়ে বসে থাকা আমাদের প্রায় পাঠক্রমের মধ্যে ছিল। এসবেরই অঙ্গ হিসাবে ছিল ভারতীভবন বা রবীন্দ্রভবনে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হলেই দৌড়োনো। মৃণাল সেন, তপন সিনহা, উৎপলেন্দু চৌধুরী, শ্যাম বেনেগাল, সত্যজিৎ রায়ের গোটা পাঁচেক সাতেক সিনেমা নিয়ে বা কিছু বিদেশী ছবি নিয়ে রেট্রোস্পেক্টিভও হতো। অনেক সময় এমনও হয়েছে আমি ক্লাস টু থ্রি তে পড়ি, কর্মকর্তারা আমাকে ঢুকতে দেবেন না, মা প্রায় ঝগড়া করে অনুমতি আদায় করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে বসে চোখ, খারিজ, জনঅরণ্য, প্রতিদ্বন্দ্বী, বাইসাইকেল থিভস, দামুল, আকালের সন্ধানে এসব সিনেমা দেখেছে। কর্মকর্তারা "ও কি বুঝবে ?" এই জাতীয় প্রশ্ন করলে মা উত্তর দিয়েছে, "না বুঝুক, তবু দেখবে।" ব্যস এরপর মা, ফিল্ম ফেস্টিভ্যালস এবং তখনকার কলকাতা দূরদর্শনের দৌলতে আমার স্কুলে পড়াকালীনই সত্যজিৎ রায়ের প্রায় সমস্ত ছবি একাধিকবার দেখা হয়ে গেল গোগ্রাসে। সিনেমাগুলো দেখার সময় মা সমানে বলে যেত সত্যজিতের অসামান্য আবহসংগীতের কথা, যে কোনো ছবি পরিচালনায় হাত দেওয়ার

আগেই উনি কেমনভাবে প্রত্যেক চরিত্র, সেট এবং কস্টিউম সব কিছুর স্কেচ ইত্যাদি নিজে হাতে করতেন সেসব খুঁটিনাটির কথা। তখন বাড়িতে নিয়মিত আসা আনন্দমেলা, দেশ পত্রিকায় মাঝে মাঝেই বড় করে ওঁনার ছবি থাকত। মুখে চুরুট, দুহাত পিয়ানোতে বা ছবি আঁকায়, ক্যালিগ্রাফিতে ব্যস্ত এমন সব ছবি। দূরদর্শনে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় ওঁনার বাংলা, ইংরেজি উচ্চারণে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতাম। সর্বোপরি শুধু ভাবতাম সুকুমার রায়ের মত মানুষ ওঁনার বাবা! যিনি কিনা আবার তাঁর অসুস্থতা নিয়ে জীবনের শেষ সময়ের কিছুটা কাটিয়েছিলেন আমাদের আদি বাড়ী যে শহরে, সেই সোদপুরের গঙ্গার ধারে। সত্যজিতের শিশু বয়েসের স্মৃতিতেও সেই সময় ধরা আছে।

আমার মনে নেই আমরা আনন্দমেলার মতোই সন্দেশ পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলাম কিনা। তবে বাড়ীতে যে বেশ ভালো রকমের সন্দেশের সংগ্রহ ছিল সেটা মনে আছে। দিদি পড়তো, পাশে সন্দেশের স্বাদ পেতাম আমিও। আর তাতে অনবরত প্রফেসর শংকু, ফেলুদা, সত্যজিতের স্কেচ থাকত পাতায় পাতায়। আর এক বড় উত্তেজনা ছিল বইমেলা থেকে হাতে একগাদা করে ফেলুদা, প্রফেসর শংকুর বই কিনে ফেরা। খাওয়া নাওয়া ভুলে 'বাদশাহী আংটি', 'গ্যাংটকে গন্ডগোল', 'আরো বারো' পড়া। আর আমাদের বাড়িতে থাকা ওঁনার আরো যে দুটি বই আমাদের বিশেষ প্রিয় ছিল তা হল 'একেই বলে শ্যুটিং' এবং 'যখন ছোট ছিলাম'। নিজের ছোটবেলায় যদি সত্যজিৎ রায়ের ছোটবেলার গল্প পড়ে জানা যায় যে প্রথমবার জীবনে আইসক্রীম মুখে দিয়ে তিনি আইসক্রীমটা একটু গরম করে দিতে বলেছিলেন আর স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে পুরস্কার নিতে মঞ্চে উঠতে হবে শুনলেই তাঁর গায়ে জ্বর আসতো, তাহলে তাঁকে বেশ কাছের লোক বলে মনে হয় না কি ? যে মানুষ পুরস্কার, অ্যাটেনশন এসবের ভয়ে লজ্জায় গুটিয়ে যেতেন আর পাঁচটা স্বাভাবিক বাচ্চার মত, তিনিই কিনা বড় হয়ে গোটা পৃথিবীর নজর কাড়লেন আর বিশ্বের তাবড় তাবড় ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের মঞ্চে উঠলেন জলভাতের মত পুরস্কার নিতে? 'একেই বলে শ্যুটিং' বইটি ছোটদের জন্য খুব সোজা সরল ভাষায় সিনেমা বানানোর বিভিন্ন দিক নিয়ে খুঁটিয়ে লেখা। কি প্রিয় ছিল সেই বই! সেই বই থেকেই জেনেছিলাম 'পথের পাঁচালী' সিনেমায় যে দৃশ্যে কাশফুলে ভরা মাঠের মধ্যে দিয়ে অপু দূর্গা ট্রেন দেখতে দৌড়োচ্ছে, যে দৃশ্য আন্তর্জাতিক সিনেমার চালচিত্রে আইকনিক হয়ে রইল, সেই দৃশ্য শ্যুট করতে সত্যজিৎ এবং তার টিমকে কি বেগই না পেতে হয়েছিল। কারণ খানিক শ্যুটিং করার পরেই বোধহয় সপ্তাহব্যাপী গ্যাপ ছিল। দিন কতক পরে বাকি দৃশ্যের শ্যুটিং করতে গিয়ে তাঁরা দেখেন কাশফুল হাওয়া ! মাঠ ধূ ধূ ফাঁকা, শূন্য। সব কাশফুল নাকি গরুতে খেয়ে গেছে। এ বাদে ওঁনাদের যখন তখন টাকায় টান পড়তো। শ্যুটিং অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকতো। সত্যজিৎ মূলতঃ ভয় পেতেন অতিবৃদ্ধা চুনীবালা দেবী ঠিকঠাক বেঁচে বর্তে থেকে সিনেমায় তাঁর অভিনীত অংশটুকু শেষ করতে পারবেন কিনা তা ভেবেও। যাই হোক, আবার বহু পরে সেই ট্রেন ও কাশফুলের দৃশ্যের বাকি পড়ে থাকা অংশটুকুর শ্যুটিং হয়েছিল। সে বইতে কাশীতে জয় বাবা ফেলুনাথের শ্যুটিং করতে গিয়েও অতিরিক্ত ভীড়, একটি দৃশ্যের জন্য ষাঁড় জোগাড় করা ইত্যাদি নানা বিড়ম্বনার কথা খুবই মজার ছলে লেখা ছিল। বছর দশ পনেরো আগে আমার মা আমাকে সত্যজিতের স্ত্রী বিজয়া রায়ের 'আমাদের কথা' বইটি কিনে দিয়েছিল। সেই বইও খুব আগ্রহ নিয়ে পড়েছিলাম। কত কি জানা যায় সেই বই থেকেও ! আমাদের ছোটবেলায় সোনার কেল্লা বা জয়বাবা ফেলুনাথ সিনেমার প্রভাবের কারণে খানিক এবং মূলতঃ ফেলুদার মেধা, জটায়ুর হিউমার, তোপসের অনুমান ক্ষমতা, ফেলুদার চোখের ভাষা, না বলা কথা বুঝে নিয়ে বা ফেলুদার নির্দেশ মেনে তোপসের কাজ করে ফেলার ক্ষিপ্রতা, প্রতিটি ফেলুদাকাহিনীর বিশ্বাসযোগ্যতা সব নিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সন্তু কাকাবাবু, সমরেশ বসুর গোগোল সিরিজ এসব ছাড়িয়ে গোয়েন্দা কাহিনীর সম্রাট হয়ে আমার প্রাণমন জুড়ে সত্যজিৎই ছিলেন।

অন্যান্য সিনেমার কথায় আসি। ফেলুদা পেরিয়ে ক্লাস ফাইভ, সিক্স, সেভেনে পড়ার সময় একের পর এক এবং একাধিকবার অপু ট্রিলজি, অশনি সংকেত, জলসাঘর, পরশপাথর, দেবী, সীমাবদ্ধ, অরণ্যের দিনরাত্রি, কাঞ্চনজঙ্ঘা, জনঅরণ্য, মহানগর, চিড়িয়াখানা, নায়ক দেখে চলেছি দূরদর্শন বা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। সাহিত্যনির্ভর হলেও সব সিনেমার গল্প তখন পড়া নেই। এদিকে সিনেমা দেখেও চরিত্রদের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা বোঝার তেমন ক্ষমতা সে বয়েসে তৈরী হয়নি। তবু কিসের আকর্ষণে জানি না, কোনোদিনই ওঁনার সিনেমা আমার বোরিং মনে হয়নি বা মাঝপথে

উঠে যাই বলেও মনে হয়নি। শাখাপ্রশাখা, গণশত্রু, আগন্তুক তখনো তৈরী হয়নি। সেসব দেখেছি নাইন, টেন বা হাইস্কুলে পড়াকালীন। সব মিলিয়ে সত্যজিতের জীবিতকালেই সত্যজিৎ যে সিনেমাধারায় অভ্যস্ত করিয়ে দিয়ে গেলেন, তাতে আমার অজান্তেই মায়ের মনোবাঞ্ছা বোধহয় খানিক পূর্ণ হল এবং আমি কলেজে গিয়েও বন্ধুদের সঙ্গে নিছক নির্মল মজার সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে একটাও তখনকার বাজার চলতি কমার্শিয়াল বাংলা হিন্দি সিনেমায় হৈ হৈ করে যোগ দিতে পারলাম না। পরবর্তীকালে এই সংকোচ বা খানিকটা বলা যায়, এই সংকীর্ণতা কাটিয়ে অনেক নাচ গান ভরা সিনেমা এনজয় করতে আমার সময় লেগেছে।

কত সিনেমার দৃশ্য যে বিশেষ ভাবে মনে আছে। সোনার কেল্লায় উটের পিঠে চড়ে রুমাল নাড়াতে নাড়াতে ফেলুদার আপ্রাণ ট্রেন থামানোর চেষ্টা আর তার সঙ্গের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠার মতো দৃশ্য বারবার দেখলেও প্রথমবার দেখার মত উত্তেজনা অনুভব করা যায়। ট্রেনের প্রসঙ্গে মনে পড়ল সত্যজিৎ জানিয়েছিলেন অপু ট্রিলজিতে পথের পাঁচালী ছাড়া বাকি দুটি উপন্যাস অপরাজিত এবং অপুর সংসারে বিভূতিভূষণ তাঁর লেখায় ট্রেনের উল্লেখ করেননি। কিন্তু সত্যজিৎ পথের পাঁচালী ছাড়াও অপরাজিত এবং অপুর সংসার দুটো ছবিতেই ট্রেনের প্রচ্ছন্ন অনুসঙ্গ রাখলেন অপুর জীবনে একটা আসন্ন অনিশ্চয়তা বা পরিবর্তনের প্রতীক হিসাবে। আমার খুব প্রিয় ছবি সীমাবদ্ধ। সে ছবিতে মনন ও বোধে দুই মেরুতে দুই বোন। সীমাবদ্ধ সিনেমার একটি খুব প্রিয় দৃশ্য যেখানে শ্যামল ও তার শ্যালিকা টুটুল সকালের চা নিয়ে বসেছে। টুটুলের দিদি ঘুম থেকে ওঠেনি। ব্যাকগ্রাউন্ডে মৃদু সানাই। জামাইবাবু শ্যামল জিজ্ঞেস করছেন, "গন্ডগোল লাগছে ?" খুব অল্প সংলাপে এই দৃশ্যে ফুটে উঠছে দুই চরিত্রের মধ্যে কোথায় যেন এক না বলা ডিসকমফোর্ট, সন্দেহ, এমনকি চাপা রোম্যান্সও। কিংবা 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র মত সিরিয়াস সিনেমার সেই দৃশ্য ... যেখানে কেয়ার বাড়িতে দ্বিতীয় দিন এসেছে সিদ্ধার্থ। তাদের দুজনার কথার মাঝখানে ঘরে ঢুকলেন কেয়ার বাবা এবং মাসি। মাসির মাথায় যন্ত্রনা। কেয়া স্যারিডন এনে দেয়। মাসি জানান ওতো বড় ওষুধ তার গলা দিয়ে নামবে না। খুব সাধারণ স্বাভাবিক ডায়লগ। কিন্তু তার বলার ধরণ ও বডি ল্যাংগুয়েজে বেশ একটা বড়লোকি স্ট্যাটাস সম্মন্ধে মাসির যত্নলালিত সজাগ মনোভাব, ন্যাকামো, কেয়ার সরল মানসিকতা বা পাশের চেয়ারে নিম্নবিত্ত জীবনের প্রতীক হিসাবে সিদ্ধার্থর বসে থাকা অনেককিছু যেন মুহূর্তে ফুটে ওঠে। কেয়ার ভ্যাবাচ্যাকা ভাব, সিদ্ধার্থর সামনে শ্যালিকার প্রতি অনুরক্ত কেয়ার বাবার নীরব অস্বস্তি এবং সর্বোপরি পারিবারিক আর্থিক পরিস্থিতির কারণে দু বছর ডাক্তারি পড়ে ছেড়ে দেওয়া সিদ্ধার্থর হঠাৎ 'মেকানিজম অফ সোয়ালোয়িং' এর ক্লাস মনে পড়া প্রচ্ছন্নভাবে দৃশ্যটিকে ভীষণ মজার ও সরস করে তোলে। আবার সংসারে কেয়ার একাকিত্ব বুঝতেও আমাদের অসুবিধে হয় না। সত্যজিৎ সিনেমায় খুব বেশি বিমূর্ততায় বিশ্বাস করতেন না। গল্প বলায় করতেন। কিন্তু সেইসব গল্প বলতে গিয়ে চরিত্রদের প্রতিবাদ, প্রেম, হাসি, হতাশা, বুদ্ধিমত্তা, জটিলতা কোনোকিছু তেমন সোচ্চার না হয়েও কি অবলীলায় পরিষ্কার হয়ে উঠত দর্শকদের সামনে।

সত্যজিতের ছবির কথা শেষ করা যায় না তাঁর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের কথা না বললে। পথের পাঁচালী, পরশপাথরের রবিশঙ্কর, জলসাঘরের বিলায়েৎ খাঁর সঙ্গীত পরিচালনার মতই তাঁর নিজের পরিচালনার মিউজিক স্কোর প্রতিটি ছবিতে স্বকীয় ও অনবদ্য। জনঅরণ্য সিনেমায় মোমের আলোর আলো-আঁধারিতে সোমনাথ যখন তার বৌদিকে বলছে, "কি ভেবেছিলাম আর কি হয়ে গেল ! আমার কাজটা খুব বাজে বৌদি" ... তখন সে দৃশ্যের ব্যাকগ্রাউন্ডে রেডিওতে "ছায়া ঘনাইছে বনে বনে" রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যবহার অতুলনীয়ভাবে সোমনাথের মনের অবস্থা জানিয়ে দিয়ে যায়। উদাহরণ বলে শেষ করা যাবে না।

কোনো এক সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ নিজেই বলেছিলেন, "ছবিতে দুটো ইমপিওরিটি আমি চাই না, একটা হচ্ছে পিকটোরিয়াল আর অন্যটা হচ্ছে থিয়েট্রিক্যাল। যদি সেটা ইন্টিগ্রেটেড উইথ দ্য ন্যারেটিভ না হয়।" এই কারণেই বোধহয় তাঁর প্রতিটি ছবি এতো সৎভাবে আমাদের চেতন ও চিন্তায় ধাক্কা মেরেও বুনোটে এতো নির্ভার, এতো স্বাভাবিক। কি সংলাপে, কি ক্যামেরার অবস্থানে, অভিনয়ে বা সঙ্গীত ও সম্পাদনায় .... কোথাও অতিরঞ্জিত নয় ।

সাংবাদিক ও লেখক শঙ্করলাল ভট্টাচার্য্যকে এক সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ বলেছিলেন, "নব্বই বছর বাঁচলে আশি অব্দি ছবি করতে চাই।" আমাদের দুর্ভাগ্য তা হল না। মনে পড়ে, কি উত্তেজনায় চোখে জল নিয়ে আমরা গোটা পরিবার বিরানব্বই সালে টিভিতে ওঁনাকে হাসপাতালের বেডে শুয়ে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্টের জন্য অস্কার অ্যাওয়ার্ড নিতে দেখেছিলাম।

ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ছবি করার ডাক এসেছিল। কোনোদিন বাংলার বাইরে কাজ করতে চাননি। বরং বহু সাক্ষাৎকারে লিখে গেছেন, বলে গেছেন যে কিভাবে তাঁর চিত্রনাট্যের আইডিয়া সরাসরি হলিউড মারফৎ চুরি হয়ে স্পিলবার্গের ই.টি. হয়ে যায়! অন্য গ্রহ থেকে এক অদ্ভুত জীব ও যানের এসে নামার কথা ছিল বাংলার এক অজ গাঁয়ের পদ্মপুকুরে। আমি রাগে ঘেন্নায় ই.টি. মুভিটি আজও অ্যাভোয়েড করি।

আমাদের অতি মধ্যবিত্ত ছোটবেলা ও তার সাধারণ শহরে ফিল্ম সোসাইটি, বিদেশি ফিল্ম পত্রিকা, এখনকার ইউটিউব, নেটফ্লিক্স কিছুরই ঘনঘটা ছিল না। তবু মৃণাল সেন, শ্যাম বেনেগাল, তপন সিনহা, ঋত্বিক ঘটক আর সবার ওপরে সত্যজিৎ আমাদের যে চোখ ও মন খুলে দিয়ে গেছিলেন তার ভরসাতেই আজও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র জগতের মণিমুক্তো হাতড়ানোর কিছুটা চেষ্টায় থাকি। বড় হয়ে আব্বাস কিয়ারোস্তমির 'টেস্ট অফ চেরি'-র রসগ্রহন করতে পারতাম না যদি ছোটবেলায় সত্যজিতের সৃষ্টির পূর্ণাঙ্গ স্বাদ না পেতাম।

মহুয়া সেন মুখোপাধ্যায়

ছোটো গল্পকার সত্যজিৎ ও সাধারণ মানুষগুলি

অফিস থেকে ফেরার সময়ে, ঠিক বাড়ির কাছে এসে হয়ে যায় লোডশেডিং। তাকে রোজকার জীবনের একটা অঙ্গ হিসেবে মেনে নিয়ে, এক পা এক পা করে মেন্টাল ম্যাপে-এর ওপর নির্ভর করে তিনতলায় নিজের ফ্ল্যাটে উঠতে থাকেন একজন মানুষ – এটা নিয়েই গল্প। আমাদের প্রত্যেক দিনকার জীবনে দেখা এক অতি সাধারণ বিষয়। মুখ্য চরিত্র সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যহীন। কিন্তু গল্পটি? লেখকের বর্ণনা দেবার অনবদ্য স্টাইলে, বিষয়বস্তুর মৌলিকতায়, মুহূর্ত তৈরী করায়, শেষ মুহূর্ত অব্দি টানটান ধরে রাখে, বোঝা যায়না যে কি পরিণতির দিকে এগোচ্ছে – সত্যজিত রায়ের এই ছোট গল্প, 'লোডশেডিং'।

আশির দশকে বড় হয়ে ওঠা কিশোর পাঠকদের কাছে ঐশ্বর্য ভান্ডার ছিল সত্যজিতের ছোট গল্প। প্রত্যেকটি গল্পের বিষয়বস্তু এতো মৌলিক – সেই কমবয়সেও অনেকবার পড়েও বিস্ময় ফুরোতো না। কতবার ফিরে ফিরে গেছি চলন্ত ট্রেনের কামরায়, যেখানে ম্যাজিসিয়ান সুরপতির সামনে উপস্থিত হন তার গুরু ত্রিপুরাচরণ মল্লিক। শেখাচ্ছেন আংটি আর আধুলির ম্যাজিক 'দুই ম্যাজিসিয়ান' গল্পে। তার শেষ অসামান্য ম্যাজিক ট্রিকটা দিয়ে যাচ্ছেন শিষ্যকে। কেমন এক অজানা পরিণতির ভয়ে শিউরে উঠতাম, যখন ইমলিবাবা বলেন 'বালকিষানের মৃত্যু নেই, সে অমর।' মুখস্থ বলতে পারতাম "সাপের ভাষা সাপের বিষ, ফিস্ ফিস্। বালকিষণের বিষম বিষ ফিস্ ফিস্ ফিস্ ফিস্ – প্রত্যেকবার একইভাবে রোমাঞ্চিত হয়েছি 'খগম' পড়ে। আবার ম্যাকেঞ্জি ফলের স্বাদ, গুনপনায় মোহিত হয়েছি; কতবার গল্পটি পড়ার সময় ভেবেছি সত্যি যদি কোনো সাহেবের পরিত্যক্ত বাংলোর বাগানে ফলত, সমস্ত রোগ সারিয়ে ফেলার এক জাদু-ফল ? আর যখন জনার্দন স্যার চাঁদনি রাতে জানলার কাছে এসে নাকি সুরে ডাকেন "শিবরাম ও শিবরাম" বা ক্লাসরুমে চশমা খোলাতে দেখতে পাওয়া যায় ওনার চোখের সাদা অংশটুকু সম্পূর্ণ লাল, তখন উনি রাক্ষস কিনা ভেবে শিবুর সাথেই আশংকায় কাঁটা হয়ে উঠেছি,তাঁর 'শিবু ও রাক্ষস' গল্পে। কতরকমের বিষয়বস্তু। কত মণিমুক্তো।

আশ্চর্যজনক ভাবে এই মধ্যবয়সেও যখন বাংলা ছোট গল্পের এই সমুদ্রে ডুব দিই এখনো সত্যজিৎ রায়ের ছোট গল্প উঠে আসে হাতের মুঠোয়। কেন ? গল্পগুলোতো প্রধানতঃ কিশোর পাঠকদের জন্য লেখা হয়েছিলো। বয়সের সাথে সাথে পরিণত হয়েছে আমাদের জেনারেশন, অভিজ্ঞতা বেড়েছে; সমকালীন বাংলাগল্পও তার বিষয়বস্তু, শৈলী, নানানরকম পরীক্ষা নিরীক্ষা নিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। আর এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে সত্যজিতের গল্পগুলো নতুন আলোয় দেখার একটা দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী হয়েছে। এখন যেমন, বিষয়বস্তুর মৌলিকত্ব ছাড়াও নজরে আসে সত্যজিতের পরিমিতিবোধ –, সেটা নিয়ে বক্তব্য রাখার তো কোনো জায়গা নেই। তার সিনেমার মতোই, গল্পেও একটা অতিরিক্ত লাইনের বাহুল্য খুঁজে পাওয়া যায় না বললেই চলে। সেটা এখন নতুন ভাবে মুগ্ধ করে। ইদানিংকালে পড়ার সময়, আরো কিছু জিনিস খেয়াল করতে শুরু করলাম। যেমন চোখে পড়লো এক ধরণের মানুষ বা চরিত্ররা যাদেরকে আমরা সত্যজিতের গল্পে দেখতে পাই, তারা যেন এই প্রচন্ড দ্রুতগতিতে বদলে যাওয়া সময়ে, প্রায় হারিয়েই যেতে বসেছেন। এরা বোধহয় আমাদের ফেলে আসা সময়ের মানুষ; আজকাল এনাদের উপস্থিতি আর চোখে পড়ে না। অথবা বলা যায় আমাদের আজকের সময়ে 'কোনো তথ্য ভালো করে অনুধাবন করার আগেই, নতুন তথ্যের সশব্দ উপস্থিতিতে দিশেহারা' মনের ছাঁকনি দিয়ে এই মানুষগুলো প্রায় বেরিয়ে গেছেন। তাই ওনার গল্পের সেরকমই কয়েক জন চরিত্রকে খোঁজার চেষ্টা করলাম। এই ছোট পরিসরে।

কিরকম মানুষ তারা ?

একজন অভিনেতা, যিনি নিজের যৌবনে প্রেমে পড়েছিলেন স্টেজের। অতি যত্নে নিজের গুরুর কাছে শিখেছিলেন অভিনেতার দায়বদ্ধতা। থিয়েটারের প্রতি। নিজের চরিত্র যত ছোট বা বৈশিষ্ট্যহীনই হোক, তাকে সার্থক করে তোলাই অভিনেতার ধর্ম – এটাই 'পটলবাবুর ফিল্মস্টারের' গল্প। এই পটলবাবু, ওনার পরিণত বয়সে এসে হঠাৎ একদিন, একটি সিনেমার আউটডোর শুটিংয়ে কাজ করার জন্য এক্সট্রার চরিত্র পেলেন। প্রচুর উৎসাহ আর প্রস্তুতি নিয়ে অভিনয়স্থলে উপস্থিত হয়ে তিনি দেখলেন, তার কাজটা হচ্ছে তিনি হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে নায়কের সাথে ধাক্কা খাবেন এবং তার মুখ থেকে বেরোবে একটাই শব্দ – "আঃ"। আশাভঙ্গ হয়ে, এককালে নিজের থিয়েটারে যথেষ্ট ভালো ভালো চরিত্রে অভিনয় করা পটলবাবু যখন "আঃ" লেখা দুমড়ানো কাগজের সাথে, নিজের সকাল থেকে হওয়া আশাটুকুকে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন ভাবছেন, তখনি তার মনে পড়লো তার গুরুর কথা ...

"অনেককাল আগের একটা ক্ষীণ স্মৃতি পটলবাবুর মনের মধ্যে জেগে উঠলো। একটা গম্ভীর সংযত অথচ সুরেলা কণ্ঠস্বরে বলা কতগুলো অমূল্য উপদেশের কথা – একটা কথা মনে রেখো পটল, যত ছোট পার্টই তোমাকে দেওয়া হোক, তুমি জেনে রেখো তাতে কোনো অপমান নেই। শিল্পী হিসাবে তোমার কৃতিত্ব হবে সেই ছোট্ট পার্টটি থেকেও শেষ রসটুকু নিংড়ে বার করে তাকে সার্থক করে তোলা।" তার সাথে দুমড়ানো কাগজে লেখা ওই "আঃ" শব্দটির ব্যবহার, অভিনেতা পটলবাবুর মনে ধরা পড়লো কতরকমের ব্যাখ্যা নিয়ে। –

"চিমটি খেলে মানুষ যেভাবে আঃ বলে, গরমে ঠান্ডা শরবত খেয়ে মোটেই সেভাবে আঃ বলে না... এ দুটো আঃ একদম আলাদা রকমের; আবার আচমকা কানে সুড়সুড়ি খেলে বেরোয় আরো একরকম আঃ। এ ছাড়া আরো কতরকমের আঃ রয়েছে – দীর্ঘশ্বাসের আঃ, তাচ্ছিল্যের আঃ, অভিমানের আঃ, ছোট করে বলা আঃ, লম্বা করে বলা আ---হঃ ...। আশ্চর্য! পটলবাবুর মনে হলো তিনি যেন ওই একটি কথা নিয়ে আস্ত একটি অভিধান লিখে ফেলতে পারেন।"

ওই আঃ শব্দে তার অভিনয় জীবনের শিক্ষা টুকু উজাড় করে দিলেন তিনি। খুব সাধারণ অবস্থার মানুষ পটলবাবু – জাগতিক সাফল্য বলতে যা বোঝায়, তার কিছুই পাননি; দিনের শেষে অনায়াসে ছেড়ে দিলেন যে অর্থটুকু পাবার কথা ছিল... মন ভরা আনন্দ নিয়ে বাড়ী ফিরে গেলেন।

'অসমঞ্জবাবুর কুকুর' গল্পে সারাজীবন একা থাকা নিতান্ত মধ্যবিত্ত অসমঞ্জবাবুর শখ ছিল একটি পোষ্য কুকুরের। তার সাধারণ জীবনযাপনের সাথে মানানসই কুকুর এলো-ব্রাউনি।

এই আপাত সাধারণ ব্রাউনির মধ্যে প্রকাশ পেলো অসাধারণ গুণ। ব্রাউনি হাসে। যেখানে হাসার কথা, অর্থাৎ মানুষের স্বাভাবিক হিউমারবোধে তারা যেখানে যখন, হাসে সেখানেই। অসমঞ্জবাবু তার সীমিত জ্ঞানে (এবং গুগল না থাকায়) জানতেন না যে কুকুরের হাসি কি ভীষণ অভিনব এক অত্যাশ্চর্য বিষয় – শুধু আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। আরো একটা জিনিষ বুঝতে পারলেন অসমঞ্জবাবু যে ব্রাউনির মধ্যে একটা জীবনবোধ আছে – তার সব হাসি একরকম নয়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার হাসির ধরণ বদলে যায়। অভিজ্ঞ পশুচিকিৎসক-এর কাছ থেকে শুনলেন –

"আপনার কুকুরের চেহারাতেই যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে; তার সঙ্গে আবার হাসিটাসি জুড়ে দিয়ে আরো বেশি অসাধারণ করে তুলবেন না। তেইশ বছর কুকুরের ডাক্তারির অভিজ্ঞতা থেকে বলছি আপনাকে – কুকুর কাঁদে, কুকুর ভয় পায়, কুকুর রাগ, ঘৃণা, বিরক্তি হিংসে এ সবই প্রকাশ করে, এমন কি কুকুর স্বপ্নও দেখে; কিন্তু কুকুর হাসে না"।

অসমঞ্জবাবু ঠিক করলেন তিনি বাইরের কারো সাথে এ নিয়ে কথা বলবেন না।

কিন্তু জানাজানি হলো।

খবরটা ছড়িয়ে পড়ার পর ব্রাউনি পেতে থাকে লোভনীয় শোডগ হবার অফার। একজন বিদেশি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে আসে অপ্রত্যাশিত অর্থের প্রলোভন। আর তার সামনেই ব্রাউনির হাসির এক অন্য দিক বেরিয়ে আসে।

'এ হাসি আগের কোনও হাসির মতো নয়;এ একবারে নতুন হাসি।'

"বাট হি ইস ল্যাফিং !"

মুডি সাহেব কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়েছেন, আর দুই চোখ দিয়ে গিলছেন এই দৃশ্য।...

ব্রাউনির হাসি থেমেছে। অসমঞ্জবাবু তাকে কোলে তুলে নিয়ে চোখের জল মুছিয়ে বললেন।

"সাহেব ভাবছেন টাকা দিলে দুনিয়ার সব কিছু কেনা যায়, তাই শুনে কুকুর হাসছে।"

"বটে? আপনার কুকুর বুঝি দার্শনিক ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"।

"তার মানে আপনি কুকুর বেচবেন না ?"

"আজ্ঞে না"।

আমেরিকান ব্যবসায়ীর অবিশ্বাস্য অংকের এই টাকাকে হেলায় উড়িয়ে দেন তিনি। ব্রাউনি তার সবচেয়ে আপনজন। তার বিশেষ গুণটিকে তিনি তার জীবনযাপনের একটি অংশ হিসাবে গ্রহণ করে নেন – একদম স্বাভাবিকভাবে।

'বঙ্কুবাবুর বন্ধু' গল্পে গ্রাম বাংলার একটি প্রাইমারি ইস্কুলের ভূগোল শিক্ষক বঙ্কুবিহারীবাবু, পৃথিবীর দেশ – মহাদেশের ওপর তার জ্ঞান, আগ্রহ এবং স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসার জন্য তার কাজ খুব ভালোবেসে করেন। আর কিছুটা হলেও ছাত্রদের মধ্যেও রেখে যেতে চান, যাতে তাদের দৃষ্টি প্রসারিত হয় ...গ্রামের বাইরে-সারা পৃথিবীতে। কিন্তু তার নরম, নির্বিরোধী চরিত্রের জন্য তিনি ছাত্রদেরই নয় গ্রামের বড় মানুষদের কাছও ঠাট্টার পাত্র; তাকে অকারণে হেনস্থা করে চলে সবাই।

"এই তো সেদিন, দু মাসও নয় ভূতের কথা হয়েছিল। বংকুবাবু সচরাচর মুখ খোলেন না। সেদিন কি জানি কি হোল, হঠাৎ বলে ফেললেন যে তাঁর ভূতের ভয় নেই। আর যায় কোথায় ? এমন সুযোগ কি এসব লোকে ছাড়ে ? রাত্রে বাড়ি ফেরার পথে বঙ্কুবাবুকে যাচ্ছেতাইভাবে নাজেহাল হতে হলো। মিত্তিরদের তেঁতুলগাছের তলায় কে এক লিকলিকে লম্বা লোক ভুসোটুসো মেখে অন্ধকারে তার পিঠের ওপর পড়লো ঝাঁপিয়ে। এই আড্ডারই কারো চক্রান্ত আর কি।"

যে মানুষটা এরকম ঠাট্টার পাত্র, তিনি কিন্তু বিশ্বাস করেন যে যদি কখনো অন্য গ্রহ থেকে কেউ আসে, পৃথিবীর যে কোনো জায়গার মতো তাদের ছোট গ্রামে আসতেই পারে। কেন নয়? এহেন সাধারণ গ্রামে উপস্থিত হলো ক্রেনিয়াস গ্রহ থেকে একজন এলিয়েন, আর তার সাথে দেখা হলো বঙ্কুবাবুর। শুধু দেখা হওয়া নয় বন্ধুত্বও। কত গল্প বলে তাকে ক্রেনিয়াস গ্রহের বাসিন্দা অ্যাঙ; তার না দেখা পৃথিবীকে চোখের সামনে এনে দেয়। অন্য গ্রহ থেকে আসা তার এই নতুন বন্ধু তাকে বার্তা দেয় যে মানুষের থেকে হাজার গুণ উন্নত প্রাণী আছে এই মহাবিশ্বে। বঙ্কুবাবুর মধ্যে রাতারাতি পরিবর্তন এনে দেয় এই বন্ধুত্ব। শুধু আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল; সেটা খুব অনায়াসে এসে গেলো।

'কোথাকার কোন সৌরজগতের এক গ্রহ, তার নাম হয়তো কেউ শোনে নি, তারই একজন লোক – লোক তো নয় অ্যাঙ – তার সঙ্গে এসে আলাপ করে গেলো। কি আশ্চর্য। কি অদ্ভুত। সারা পৃথিবীতে আর কারো সাথে নয়, কেবল তার সঙ্গে। আ, এই এখন থেকে, অন্তত একটা অভিজ্ঞতায়, তিনি সারা পৃথিবীতে এক ও অদ্বিতীয়।

বঙ্কুবাবু দেখলেন তিনি আর হাঁটছেন না তিনি নাচছেন ।'

একজন ছাপোষা কলকাতায় থাকা বাবা, যার অসুস্থ সাত বছরের ছেলেকে প্রত্যেক রাতে গল্প শোনানোই 'টেরড্যাকটাইলের ডিম্' গল্পের বদনবাবুর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সারাদিনে দশটা পাঁচটার জীবন থেকে বেরিয়ে, শহরে তিনি একটু খোলা জায়গা খোঁজেন-নিশ্বাস ফেলার জন্য। তার ছেলের গল্পের প্লট খোঁজার জন্য।

"কেরানি হলেও কল্পনাপ্রবণ তিনি। এই কার্জন পার্কেই বসে মনে মনে কত গল্প ফেঁদেছেন কিন্তু লেখা হয়ে ওঠেনি কোনোদিন। সময় কোথায় ? লিখলে হয়তো নামটাম করতে পারতেন এমন বিশ্বাস তার আছে ... কিন্তু গত কয়েক মাসে যে কটি গল্প বলেছেন তাও যে তেমন জমেনি তা বিল্টুর মুখ দেখেই বোঝা গেছে। তা হবে না-ই বা কেন ? একে তো এমনিতেই অফিসের চাপ, তার উপর বিশ্রামের জায়গার সাথে চিন্তার সুযোগটিও লোপ পেয়েছে।"

সেরকম এক সময়ে, একজন মানুষ হঠাৎ এসে আলাপ করেন তার সাথে একটি যন্ত্র নিয়ে, যেটার সাহায্যে কিনা অতীত বর্তমান সব জায়গায় ভ্রমণ করা যায়। সেই মানুষটার কাছে বদনবাবু শোনেন আশ্চর্য সব গল্প, হাজার হাজার বছর আগের। এমনকি কেমন ছিল গঙ্গার পারে ওই জায়গা, কারা ঘুরে বেড়াতো সেখানে।

"আগন্তুক আকাশের দিকে মুখটা তুলে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন

'হাসি পায়। তিনশো বছর আগে, এইখানে, ঠিক এই বেঞ্চিটার জায়গায়, একটা কুমির ও তার মাথায় একটা বক বসে রোদ পোহাচ্ছিল। ওই খড়ের নৌকোটার জায়গায়, একটা পাল তোলা ওলন্দাজ জাহাজের ডেক থেকে এক নাবিক একটি গাদা বন্দুক দিয়ে কুমিরটাকে মারে।এক গুলিতেই কুমির শেষ। বকটি ঝটপটিয়ে উড়ে পালাবার সময়ে তার একটি পালক খসে আমার পায়ের সামনে পড়ে। এই সেই পালক।' আগন্তুক থলির মধ্যে থেকে একটা ধবধবে সাদা পালক বার করে বদনবাবুর হাতে দিলেন।"

টাইম ট্রাভেলারের কাছে এরকম সব গল্প শুনতে শুনতে ডাইনোসরদের সময়ে ফিরে যান আর তার কাছ থেকে হাতে পান একটি ডিম্ – টেরড্যাকটাইলের ডিম্। অবশ্যই এই সাক্ষাৎ শেষে বাড়ি ফেরার পথে তিনি বোঝেন এক জালিয়াতের পাল্লায় পড়েছিলেন, তার মানিব্যাগ খোয়া গেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, তাতে এতটুকু দুঃখিত হননা বদনবাবু; ছেলে বিল্টুর জন্য তিনি নিয়ে যেতে পারছেন সোনার খনি, গল্পের ভান্ডার।

সত্যজিৎ রায়ের গল্পভাণ্ডারে সেপটপাসের ক্ষিধে, খগম অথবা ফ্রিৎসের মতো হাড় হিম করে দেওয়া অথবা দুই বন্ধু বা বাতিকবাবুর মতো শেষ লাইনের বিখ্যাত চমকের গল্পগুলি আছে, সেগুলো তো কখনো ভোলা যায় না। ওপরের ছোট গল্পগুলো তার অন্তর্ভুক্ত নয়। আবার এই গল্পগুলোতে যে চমকপ্রদ উপাদান নেই তা কিন্তু নয়। গল্পগুলোতে যে ঘটনাগুলো ঘটে তার প্রত্যেকটি অত্যন্ত আলাদা ধরণের; তাই মনোযোগ আকর্ষণ করে মূলত ঘটনাগুলোই। প্রথমবারই হয়তো চরিত্রগুলো ততটা দৃষ্টি আকর্ষণ নাও করতে পারে। কিন্তু গল্পগুলোর কাছে আবার ফেরত গেলে নজরে আসে, প্রধান চরিত্ররা। এনারা সাধারণ মধ্যবিত্ত, তথাকথিত ভাবে তেমন সফল নয়, বলা যেতে পারে বেশ অকিঞ্চিৎকর এদের অস্তিত্ব। এনারা জীবনে বিরাট কিছু করে সাফল্যের লাইমলাইটে আসার চেষ্টাই করেন না।

ভেবে দেখতে গেলে এরকম চরিত্রদেরকে আমাদের বড় হয়ে ওঠার সময়ে খুবই দেখতে পেতাম। আমাদের চারপাশে। পরিবারে। পাড়ায়। যারা খুব সাধারণ ভাবে নিজেদের জীবন নিজেদের মতো করে কাটাতেন, আর অনেক সময়ে যে জিনিসটাকে ভালোবাসতেন তার মধ্যে ডুবে থাকতেন, কোনো লাভের প্রত্যাশা ছাড়াই। সেটা পাড়ার লাইব্রেরি বানানো, রাজনীতি, সংগীতচর্চা, সাহিত্য,খেলা যা কিছু হতে পারতো; কিন্তু সারাজীবনে তারা খ্যাতি বা অর্থ কোনোটাই পেতেন না আর তাতে তাদের কিছুই যেতো আসতো না। পটলবাবু অভিনয়কে ভালোবাসতেন, বঙ্কুবাবু তার নিজের আর ছাত্রদের জন্য জ্ঞান আহরণ করতে, বদনবাবু ছেলের জন্য খুঁজতেন গল্পের প্লট, লেখক হবার জন্য নয়।

এই প্রত্যেকটি গল্পে এই সাধারণ মানুষগুলি একটি অসাধারণ জিনিসের সামনে আসেন – পটলবাবু সিনেমায় অভিনয় করার সুযোগ পান, বঙ্কুবাবুর আলাপ হয় একজন সত্যিকারের এলিয়েনের সাথে, অসমঞ্জবাবুর কুকুর ব্রাউনি এক অত্যাশ্চর্য গুণের পরিচয় দেয় , বদন বাবু দেখা পান টাইম ট্র্যাভেলারের এবং তার পরে এই চারটি চরিত্রেই এক আশ্চর্য উত্তরণ ঘটে ... এই সাধারণ মানুষগুলো এক ঝটকায় অসাধারণ হয়ে ওঠেন।

অভিনেতা পটলবাবু যেন ফিরে আসেন – তার নিজের কাছে, তার গুরুর কাছে, থিয়েটারের কাছে। ব্রাউনি অসমঞ্জবাবুর প্রিয়জন; অবিশ্বাস্য রকমের অর্থও ওনার কাছে সম্পূর্ণ মূল্যহীন। ছাপোষা বদনবাবু, ছেলে বিল্টুর মুখে হাসি দেখার জন্য, তাকে নতুন গল্প বলার জন্য, একমুহূর্তে টাকার শোক ভুলে যান। যে মানুষগুলো অহেতুক তাকে ছোট করে, বিদ্রুপ করে, প্রথমবার, তাদেরকে জীবন থেকে বার করে দেবার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন বঙ্কুবাবু। অতি সহজেই। সেভাবে দেখতে গেলে চরিত্রগুলির এই উত্তরণ হবার যে উপাদান কিন্তু তাদের মধ্যেই ছিল। পরিস্থিতি তার ওপর একটা বিশেষ আলো ফেললো আর এই মানুষগুলো নিজের শিক্ষা, মূল্যবোধে উজ্জল হয়ে উঠলো, আর তার সাথে সাথে যেন গল্পগুলিও এক অন্য মাত্রা পেলো ।

যখন, এই সময়ে দাঁড়িয়ে, এই গল্পগুলোর দিকে তাকাই, উপলব্ধি হয় সত্যজিৎ এই মানুষগুলোকে দেখতে পেতেন, তাদের সাধারণ জীবনযাপন, তাদের জীবনের প্রতি ভালোবাসা, কোনো কিছুর ওপর বিশ্বাস – এগুলো কিন্তু কখনো তার চোখ এড়িয়ে যায়নি। কার্জন পার্কে একা বসে থাকা এক বাবা অথবা প্রত্যন্ত গ্রামে থাকা এক ভূগোল শিক্ষকের মতো মানুষগুলোর, জীবনের প্রতি যে ভীষণ আশাবাদী মন, রোজকার ছোটো বদ্ধ জীবনের মধ্যে কিছুতেই হারিয়ে না যাবার ইচ্ছেটার ওপর বা তাদের মূল্যবোধের ওপর ওনার একটা গভীর শ্রদ্ধা ছিল। এই প্রত্যেকটা গল্পে সেই মূল্যবোধটারই কিন্তু জয় হয়েছে। অভিনেতার আদর্শ জিতেছে, পোষ্যের প্রতি অকৃতিম ভালোবাসা জিতেছে। সেই জিতটা উচ্চকিত নয়, তাতে কেউ হাততালি দেয় না, ফ্লাশের ঝলকানি পড়ে না, কেউ জানতেও পারে না ...। এই জয়টা তাদের নিজের কাছে নিজের। আর এই প্রত্যেকটা গল্পে, এই সাধারণ মানুষগুলোর একান্ত জিতটুকু খুব যত্ন নিয়ে এঁকেছেন সত্যজিৎ রায়।

তাপস কুমার রায়

সৌমিত্র চ্যাটার্জি থেকে সৌমিত্র কাকু

কিছু কিছু আলোর মাঝে জীবন থাকে। সব আলোর মাঝে থাকে না। সৌমিত্র চ্যাটার্জি সেরকমই এক আলো। এ লেখা লিখি লিখি করে আর লেখা হয়ে ওঠেনা। রোজ কতশত চিঠিতে ভরে যাচ্ছে ডাকঘর। সব চিঠি কি আর গন্তব্য খুঁজে পায়? রোজ এরকম কতশত মানুষের সাথে দেখা হয়। সব মানুষ কি আর মনে থেকে যায়। সৌমিত্র চ্যাটার্জির সাথে আমার প্রথম দেখা বোধ হয় জয় বাবা ফেলুনাথে। তারপর থেকে যত বার ফেলুদা পড়েছি উনি অক্ষর মাত্রা পেরিয়ে সাদা পৃষ্ঠার সান বাঁধানো ফুটপাত ধরে কালো হরফের আঁকা দরজা খুলে ঝকঝকে হাসি নিয়ে দাঁড়িয়েছেন, চারমিনারের রিং ছাড়তে ছাড়তে বলেছেন, "তোপসে ঠিক ভালো ঠেকছে নারে"। চেহারার সাথে চরিত্রের এই অদ্ভুত খেয়ালে আসল মানুষ হারিয়ে যায়। তাই ফেলুদার বাইরে আরেক মানুষ জেগে ওঠে। যে সাদা কালো পর্দা আলো করে, কিছুটা হলেও অহংকারী মনে হয়, আর বাংলা সিনেমার সেলেব্রিটি। সেলেব্রিটিদের আমি ছোটবেলা থেকেই পছন্দ করিনা তাই সেই সৌমিত্র বালক মনে আলো ফেলে না। আমার জীবন অপেক্ষাকৃত নিরস। মনে পড়ার মতো মজার গল্প নেই। আর যদিবা থাকে সেইসব গল্পের চরিত্রেরা যশস্বী নন। আমি যশস্বী মানুষ এড়িয়ে চলি। মানুষ মাত্রেই অকারণে অল্পবিস্তর দাম্ভিক, অন্যান্য জীব তুলনায়, যশস্বী মানুষ আমার ধারণা আরও বেশি। যারা সেলেব্রিটি আমার ধারণা তারা নিজেদের ভুলে যেতে ভালবাসে। অনেক পরে "আকাশকুসুম" দেখে মনে হয়েছিলো চরিত্রের বাইরের অস্তিত্ব আসলে রূঢ় বাস্তব। তার সাথে কল্পনার মিল খোঁজা বৃথা। সেখানে সব সেলেব্রিটি এক নাও হতে পারে।

যাইহোক ফেলুদার বাইরে নায়ক সৌমিত্র আমার মনে কোনদিনই সেরকম দাগ কাটেনি। তাই সৌমিত্র চ্যাটার্জি আমার কাছে সৌমিত্র চ্যাটার্জিই থেকে গেছেন। গেছেন বললে ভুল হয়। গেছিলেন। ততদিন, যতদিন না পর্দার বাইরে ওনাকে দেখার সুযোগ পাই। প্রথমবার দ্বন্দ্ব বলে একটা সিনেমার শুটিংয়ে ওনাকে দেখি। সৌম্য দর্শন দেখে ভক্তি জাগবে নিয়মমাফিক। তাই যখন পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যাই, অচেনা মানুষ দেখে ওনার অন্য দিকে ফেরানো মুখ আমাকে ওনার ঔদ্ধত্যর সাথে পরিচয় করায়। বামপন্থী রাজনীতি করে আসা লোকের কি করে এতো ঔদ্ধত্য থাকে ? আমি ভাবতে ভাবতে ফিরে আসি। আমি মানুষের চরিত্র ও তার কাজকে আলাদা রাখতে ভালোবাসি তাই সৌমিত্র বাবুর কাজের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়তে থাকলেও মানুষের প্রতি একই থেকে যায়।

এবার বলি সৌমিত্র চ্যাটার্জি থেকে সৌমিত্র বাবু হয়ে ওঠার গল্পটা।

জানুয়ারি ২০১৯

শীতের কোলকাতা, ঠাণ্ডার চেয়ে কুয়াশা বেশি, পরের দিন ভোর থাকতে উঠে আমার আমেরিকা ফিরে আসার ফ্লাইট। এবারের মতো মায়ের হলুদ মাখা আঁচলে মুখ ধুয়ে মুখ মোছার পালা শেষ। মন তাই অল্প হলেও বিচলিত। আরেক দীর্ঘ অপেক্ষার শুরু হবে। রাত অল্প গভীর। কোলকাতার চোখে ঘুমের ডাক। শেরাটনের লাউঞ্জে এক ডিনার পার্টি প্রায় বুড়ো হয়ে এসেছে। সৌমিত্র বাবুর সাথে শেষ দেখা। বেরিয়ে আসার আগে বললাম কাকু আর হয়ত আমাদের দেখা হবেনা। এক মিনিটের নীরবতা ভেঙে বললেন, – কেন ? এ কথা বললে কেন ? তোমার ধারণা পরের বার তুমি আসার আগেই আমি এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছি। যতটুকু সময় বুঝে নিতে লাগে আমি কি বলেছি আর উনি কি বলছেন ঠিক তত টুকু সময় পরে আমি যারপরনাই কুণ্ঠিত হয়ে বলি, – না না, একি বলছেন ? মানে আমার সাথে আপনার দেখা

হওয়ার সম্ভাবনা কম কিনা তাই। কি করে বলি ওনাকে উনি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়; বাংলার চলচ্চিত্র জগতের জীবন্ত কিংবদন্তি আর আমি নিতান্ত সাধারণ এক ভবঘুরে। এ যাত্রায় দেখা হওয়া বা আলাপ হওয়া বয়ে চলা জীবনে নিছকই একটা ঘটনা মাত্র।

সেদিনের সেই হাস্যরসিক বৃদ্ধ মুখের নিচে যে সংকট দেখেছিলাম সেই সংকট আজ ঘটমান বর্তমান। আমি হয়তো এই গরমে দেশে যাবো আর সত্যিই ওনার সাথে দেখা হবেনা মাঝখানে চলে গেছে দু-দুটো বছর। তার একটা আবার ছিনিয়ে নিয়েছে অতি-মারী।

জুন ২০১৮

কলকাতার ব্যস্ত রাস্তায় হাজরা রোডের পাশের বইয়ের দোকানের দিকে তাকিয়ে গাড়িতে যেতে যেতে প্রশ্ন করেছিলাম সৌমিত্র বাবু আপনি রাস্তায় হাটাহাটি করেন? মানে এই আরকি বইয়ের দোকানে দাঁড়িয়ে বইয়ের মলাট উলটে পালটে দেখেন। ধরেই নিয়েছিলাম উত্তর আসবে না, বা এলেও আসবে কি করে করি বলো চারিদিকে এতো লোক ছেঁকে ধরে। ভেবেছিলাম হয় এক আত্মম্ভরি ব্যক্তি অথবা এক পরাজিত কবির দেখা পাবো। যে কবি রাস্তায় দাঁড়িয়ে বইয়ের শরীর ছুঁয়ে দেখেনা, ছন্দের অভিমান কী আর তাকে ছোঁয় ? আমাকে অবাক করে দিয়ে এক ধাক্কায় চ্যাটার্জি থেকে বাবু অথবা বাবু থেকে কাকু হয়ে সৌমিত্র বলে উঠলেন, – কী বলছ তুমি ? রাস্তায় না হাঁটলে মানুষ চিনব কি করে আর মানুষ না চিনলে ক্যামেরার সামনে তার জায়গায় নিজেকে মেলে ধরবো কি কর ? তবে নিরিবিলি পেতে একটু বেশি রাতে বা সকালে বেরোই। না হাঁটলে আমি মানুষের সাথে মিশবো কি করে, না মিশলে আমি ওদের চরিত্র চিনবো কী করে আর না চিনলে আমি তোমায় চেনাব কি করে একসময় মাঝেমাঝে অন্য মানুষ সেজে বেরোতে হতো। সাথে সাথে এটাও বলেছিলেন, – যারা বলেন রাস্তায় বেরোনো যায়না তারা আসলে বেরোতে চান না। কাকু ডাকটা আমার বন্ধু সুমনের। সৌমিত্রর সাথে আমার সম্পর্ক কাকু বলার মতো নয় কিন্তু কিছু ঘটনা এমনি যে কাকু বলে ফেলতে বাঁধেনা। সৌমিত্র বাবু থেকে কাকু হওয়ার গল্পটা বলি এবার।

জুলাই ২০১৭

গরমের শান্তিনিকেতনে হোটেলের এক অলীক সন্ধ্যায় খুব কাছ থেকে, সামাজিকতার ঢাকনার বাইরে থেকে আমি দেখেছিলাম তাঁকে। কীর্তির মোড়ক ছাড়া যশের ঘেরাটোপের বাইরে।

সেদিনের শুটিং শেষে আমি কিশুদা আর পায়েল বসে বিয়ার খুলবো কি করে ভাবছি তখন সুমন ডেকে নিয়ে গেলো সৌমিত্র বাবুর ঘরে। অন্য ঘরগুলোর চেয়ে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা তাই আমি জড়সড়। আমি এতদিন বরফের দেশে থেকেও airconditioned নই। সৌমিত্র বাবুর ঘরে তখন পরান দা আর অরুণ দা আড্ডায় মেতে উঠেছে। বাংলার নাট্য জগতের আরও দুই উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। অভিনয়ের বাইরে এরা যে কতো গুণী শিল্পী মানে কতো বড় গায়ক তা সেদিন জানলাম। এঁদের মধ্যে পরান দার গলায় যেন পান্নালালের ছায়া। শ্যামা সঙ্গীত শেষ হতে না হতে তার দরাজ গলায় ভাটিয়ালী গান গাইলেন সৌমিত্র কাকু। কণ্ঠস্বর যেন জ্যোৎস্নার আলোয় বর্ষার ফুলে ওঠা নদী-বুকে তরতরিয়ে বজরা চলেছে। যেন চোখ বন্ধ করলেই দেখা যাবে মঞ্চ আর স্পট-লাইটের আলোয় দাঁড়িয়ে রাজা লিয়ার। সেদিন পরিচয় পেয়েছিলাম আরও এক মানুষের। মানুষ না বলে যাকে শিশু বলা চলে। কথা হচ্ছিল হোটেলের বাথরুমের গঠন নিয়ে। উনি আচমকাই বললেন মন ভাল নেই। কারণ কি বাথরুমটা গলিয়াথের কথা ভেবে বানানো। ওনার মতো সাধারণ stature এর মানুষের জন্যে বানানো নয়। আমি তো অবাক। আমার মতো ছোটোখাটো মানুষের পক্ষে কষ্টকর তা আমি বিলক্ষণ

বুঝেছি। আমাকে অবাক করে দিয়ে সৌমিত্র কাকুও বললেন তার ওই একই নালিশ। উচ্চতায় আমি তার কাঁধের কাছে। ভেবে ছিলাম এই বাথরুম যেন ওনার জন্যেই বানানো। বাথরুমের কথায় তিনি সেদিন বলেছিলেন এক অদ্ভুত কথা। বলেছিলেন মানুষের রোজনামচায় সকালে আধঘণ্টা প্রাতঃকৃত্য করার সময়টা হয়ত সবচেয়ে মূল্যবান। ওই সময় মানুষ নিজের সাথে নিজে কথা বলে। আগের-দিনের যার ওপর যতো রাগ, অভিমান, দ্বেষ মনে মনে সেই আক্রোশ মিটিয়ে নেওয়া আর নতুন দিনে নতুন ভাবে তাদের মুখোমুখি হওয়ার জন্যে মনেমনে প্রস্তুতি নেওয়ার কাজটা ওই সময়ে করে নিতে হয়। কি দারুণ কথা। একটু গভীরে গেলে বোঝা যাবে তার জীবনদর্শন। নিজের সাথে নিজের এই কথোপকথনে একটা মানুষ রোজ সকালে তার পুরনো খোলস ছেড়ে নতুন খোলস পরছে, আগের দিনের গ্লানি রাগ অভিমান মুছে ফেলে আবার নতুন দিনের মুখোমুখি হচ্ছে ব্ল্যাক বোর্ড পরিষ্কার করে। আমাকে হাসতে হাসতে বলেছিলেন মানুষের উচ্চতাটা সেখানে মানুষকে বাড়তি কোনও সুবিধা দেয়না। নিজের সাথে নিজের এবং ওই জায়গার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াকে আত্মসাৎ করাটা খুব প্রয়োজন।

অনেক কথা বলা যায়না প্রকাশ্যে। অন্তরঙ্গতায় মানুষের ভিতরকার যে রূপ ধরা পড়ে সে রূপ সে বাইরে প্রকাশ করতে চায় কিনা তা জানার অবকাশ নেই আজ আর। অন্য সময় হলে আমি অনুমতি চেয়ে নিতাম। এখন উনি ধরা ছোঁয়ার বাইরে তাই নিজের কলমকে আটকে রাখাটাই শ্রেয়। তবে একটা মানুষকে তার মূল্যবোধকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে কিছু কথা লিখতেই হয়। যেমন কাকু গল্প বলেছিল পাতাউদির খেলতে আসার। শর্মিলার সাথে আলাপের সুবাদে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে রাতের আড্ডায় তিনি উপস্থিত। পরের দিন ওনার শুটিং তাই বেশি রাতে মদ খাওয়ায় ইতস্তত সৌমিত্র। নবাব কিন্তু ওসবের ধার ধারেন নি। অনেক রাতে ট্রাম বাস বন্ধ। ট্যাক্সি ও নেই। নবাব নিজে গাড়ি যোগাড় করে ড্রাইভ করে পৌঁছে দেন সেদিন। কতো রাতে বাড়ি ফেরা সেদিন উনি ভুলে গেছেন। কিন্তু পরের দিন চোখ রগড়াতে রগড়াতে যখন শট দিয়ে বেরিয়েছেন রেডিও তে শুনছেন পাতাউদি সেঞ্চুরি করে মাঠ ছাড়ছেন। এরকমই কতো আড্ডার কথা তিনি বলেছিলেন। সেইসব আড্ডায় জড়ো হতো আমাদের কিশোর-বেলার আদর্শেরা। ফুটবল জগতের পিকে চুনি, সাহিত্যের সুনীল তারাপদ, চলচ্চিত্রের উত্তম শুভেন্দু, এমনকি রাজনীতিবিদ থেকে সংবাদপত্রের ব্যক্তিত্ব। কসমস এর ম্যাচের দিন উনি কোলকাতায় ছিলেন না। ফেরার পর এমনই এক আড্ডায় ওনাকে পিকে বলেছিলেন কি ভায়া দেখলে তো কেমন নড়তেই দিলাম না তোমাদের ফুটবলের সম্রাটকে। তিনি অতিশয় দুঃখ ও ক্ষোভে বলেছিলেন, – কি করলে তুমি নিজেই জাননা। কোলকাতার ফুটবল প্রেমী মানুষ তোমার স্ট্রাটেজি দেখতে চায়নি, তারা জাদুকরের জাদু কাঠির ছোঁয়া দেখতে ছেয়েছিল। তুমি ওদের ফুটবল ইতিহাস ছুঁয়ে দেখা থেকে আটকে দিলে।

ফেলুদা থেকে সেলেব্রিটি থেকে বাবু থেকে কাকু, আমার ছেলেবেলা থেকে মাঝবয়সের আমি'র এই যে লম্বা রাস্তাটা, সেই এক সন্ধ্যায় মনে হল কত ছোট। আমি ছুঁয়ে দেখলাম স্বপ্নের সেই মানুষগুলকে, কোলকাতা চড়ে বেড়ান এক দামাল অশ্বরহির ভিতর দিয়ে। উনি ঠিক আর সেলেব্রিটি রইলেন না। তার কারণ উনি আদতে একজন যুবক যিনি জ্ঞান আহরণে রত ছিলেন। উনি ভাগ্যবান ওনার সেই অভিযানে মানিক বাবুকে পেয়েছিলেন আলো দেখাবার জন্যে। হয়ত তাই চলচ্চিত্র জগতে ওনার প্রতিভা ছাড়িয়ে গেছে অন্যগুলোকে। কিন্তু তিনি কবি ও চিত্রকর। আমি ওনার কবিতা অতটা পড়িনি এবং যতটা পড়েছি ততটা আস্বাদন করিনি। কিন্তু মানুষটার ভিতর তার চলন চালনে যে এক প্রচ্ছন্ন কবি সদাজাগ্রত তা বুঝে গেছিলাম ওই কয়দিনে। সৌন্দর্যের প্রতি টান কবিদের সহজাত। উনিও ব্যতিক্রমী নন। সেই টগবগে যুবককে পোষ মানিয়েছিল কবিতা। তবে কখনও কখনও প্রতিবাদী যুবকের রুখে দাঁড়াবার ইচ্ছে বেরিয়ে এসেছিল তার রাজনৈতিক ধ্যান ধারণার মধ্যে দিয়ে। যেটুকু দেখেছি বুঝেছি উনি ছিলেন আদ্যোপান্ত আপোষহীন।

অম্লান বোস

সৌমিত্রদা , তুমি চলেই গেলে ?

আমার সব প্রকাশনার চেষ্টার মধ্যেই এক মহামানবের বার্তা একটা দুঃসহ আবেগে ঝমঝমিয়ে ওঠে এবং অনিবার্য ভাবেই, এই লেখাটা আরম্ভ করার মুহূর্ত থেকেই তানপুরাতে একটা বিশেষ রাগিনীর মূর্ছনা শুরু হয়ে গেছে –

হঠাৎ খেলার শেষে আজ কি দেখি ছবি
স্তব্ধ আকাশ, নীরব শশী !
"তোমায় স্মরণ করি", নয়ন করি নত
ভূবন দাঁড়িয়ে আছে একান্ত
আমার "দেখা যেদিন হোল" তোমার সনে
তখন "কি" তুমি তা কে জানতো –

ক্ষমা করবেন রবীন্দ্র অনুরাগীরা, আমার এই দুর্বল প্রতিস্হাপনের মধ্যে সত্যিই কোন অসৎ বা অবমাননাকর উদ্দেশ্য নেই । কিন্তু, ন-দশ হাজার মাইল দূর থেকে কোলকাতার পনেরোই নভেম্বরের নিস্তব্ধ বিষণ্নতার মুহূর্তটা বুকের ভিতর অমৃতের উৎস মুচড়ে , নিংড়ে নীরস করে দিয়েছিল – ওপরে লেখা ঠিক ঐ (পরিবর্তিত) অনুভূতির ছায়াতে ।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় চলে গেলেন –

রেখে গেলেন অপুর অবুঝ সংসারটা, সোনার কেল্লার দূর্গপ্রাকার, হীরকরাজার দাম্ভিক মূর্তির ভগ্নাংশ, ময়ূরবাহনের শাণিত ক্রুরতা, অরণ্যের দিনরাত্রির মদির মুহর্ত, চারুলতার বিষণ্ন একাকীত্ব আর, আর অনেক অনেক কবিতা গুচ্ছ, নাটক, আবৃত্তি , রাশি রাশি পুরস্কার, অসামান্য জনপ্রিয়তা আর স্বতস্ফূর্ত সহাস্য উপস্হিতি, যেটা এখন আপামর চিত্র এবং সাহিত্যপ্রেমীদের চির সাথী হয়ে থাকবে ।

দশমীর ঢাকের শেষ রেশটুকুও মিলিয়ে গেল । আলো ঝলমল সান্ধ্য পূজামন্ডপের কল্লোলিত বিলাসিতা, রোশনাই আর রঙীন বাতাবরণ এখন বিবর্ণ, ফ্যাকাশে, অবয়বহীন, অর্থহীন । আমাদের আনন্দময়ীর বিদায়ব্যথার ঘোর কাটিয়ে আমরা মঙ্গলারতি দিয়ে প্রতিবছর আবার মাকে হৃদয় আসনে আবাহন করি – এটাই শাশ্বত ! তাই মায়ের জন্যে বিষাদটা ক্ষণস্হায়ী ।

কিন্তু ... এই চলে যাওয়াটা ? কোন বিকল্প ভাবা যায় ?

কেউ হিমালয়ের চূড়াকে ধরণীর ধূলোয় নামতে দেখেছো ? অচঞ্চল ধ্রুবতারাকে কখনও দেখেছ ঘাসের আগায় হীরের ঝলকানিকে ম্রিয়মান করে চিরকালীন পায়ের ছাপ ফেলতে ?

আমি দেখেছি, কিন্তু তিনি তখন বুঝতে দেন নি – উনি কত অসাধারণ ঐতিহ্য সৃষ্টির নায়ক, তাঁর দীর্ঘ শরীরটা কত যুগের সম্পদ অলঙ্কার বহন করে চলেছে বা, কত লক্ষ মানুষের "হৃদয়বসন্তবনে মাধুরী বিকশিত" করে চলেছেন তিনি – নিরহঙ্কারে, একবিন্দু আতিশয্যের দম্ভ ছাড়াই ।

জামশেদপুরে তখন শীতের আলতো মেজাজ উশখুশ করছে । ইস্পাতনগরীর সন্ধ্যেটা কারখানার ধোঁয়া আর হাল্কা হিমের আড়ালে ম্রিয়মান । বসুভবনে চায়ের আসরটা সবে জমে ওঠার মুখে । আমার মায়ের অতি আদরের ছোট ভাই,

আদ্যান্ত পরপোকারী, অত্যন্ত জনপ্রিয়, আপাদমস্তক সাহেবী কেতায় পরিচিত আমাদের ব্যাচেলর মামা, আপামর জনসাধারণের "পেরুদা", কয়েকটা দেশলাই কাঠি নষ্ট করে বিলিতী কায়দায় ইটালিয়ন পাইপটা দাঁতে চেপে এসে বললেন "স্টেশনে যাবি না কি – গেস্ট আসছে।"

আমার সাগ্রহ সম্মতিটা অবশ্যই ওঁর জানা ছিল –

কোলকাতার ট্রেনটা একটা সশব্দ দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিশ্চল হোল, শুধু শত শত মানুষের মিছিল উগরে দেবার অপেক্ষা। হুড়োহুড়ি, ঠেলাঠেলি, অকারণ ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেল – আমরা একটু দূরে, প্রথম শ্রেণীর দরজায় দৃষ্টি আটকে আমার অজানা অতিথিদের দেখার আগ্রহে ।

ছিপছিপে শ্যামলা এক তরুণী, হাতে স্পোর্টস কিট, প্রায় লাফিয়ে নেমে পড়ল, পেছনেই একটা সটান ঋজু শরীর, দৃপ্ত উন্নত অবয়ব আর সুদর্শন মুখ ঐ আলোআঁধারীর মধ্যে দপদপ করে জ্বলে উঠলো। হাতে স্যুটকেশ আর সাইড ব্যাগ। দীপা চ্যাটার্জি – বাংলার ব্যাডমিন্টন জগতে শীর্ষস্হানীয় , সঙ্গে স্বামী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় , জানতাম না তখন । "পেরুদা পেরুদা" বলে দীপা এসে মামাকে জড়িয়ে ধরে ফেলল – সৌমিত্র পেছনে, ছোটখাটো উৎসাহী ভীড় সামলাতে ব্যস্ত ।

বসুভবনের দোতলায় সেদিন কিছু গুণী মানুষের সমাবেশ হয়েছিল, তার মধ্যে ছিলেন মেয়েদের মিডিল স্কুলের ডাকসাইটে প্রধান শিক্ষিকা অরুণা দি, স্বল্পভাষিনী, কড়া নিয়মশৃঙ্খলায় বিশ্বাসী, রাশভারী, শিক্ষাজগতে সমাদৃতা এবং মায়ের একান্ত অনুরাগিনী। আয়তনটা যথেষ্ট ভারীর দিকেই ছিল। কবিতা আবৃত্তি, গল্প, হাসিঠাট্টার মধ্যে আড্ডা এগোচ্ছে, নায়ক নিজের বৈশিষ্ট্যে ততক্ষণে কিন্তু "সৌমিত্রদা" আর "সৌমিত্র তুমি" হয়ে উঠেছেন, কোন জড়তা ছাড়াই, অনাবিল স্বাচ্ছন্দে ।

"উফ মাসীমা, এটা ঢাকাই পরোটা তো ? আমার জন্যে কটা আর দীপার জন্যে কটা ? এই যে, কানুবাবু (পারিবারিক আলাপের মধ্যে একটু মিচকি হাসির ফাঁক দিয়ে আমার ডাকনামটা ধরেই প্রথম ঠাট্টার ধাক্কাটা এলো) আপনারা তো এইসব অসামান্য কম্বিনেশনের সঙ্গে খুবই পরিচিত, কাজেই আমরাই আপাততঃ এদের নিয়ে একটু মাখামাখি করি ? . . . . আচ্ছা দীপা –"

"তুমি খাও না সৌমিত্র ?" মা দীপ্ত মুখে ভরসা দিলেন – "দীপাকেও দিয়েছি , ওর জন্যে ভেবো না" ।

"মাসীমা – ওর তো খেলাধূলোর ব্যাপার। লোভে পড়ে খেয়ে নেবে আর কালকের ম্যাচে ডোবাবে। না না মাসীমা, ওর ভাগটা আমাকেই দিয়ে দিন।" তামাশাটা কিন্তু কোন ছায়াছবির বাঁধান ডায়ালগ নয়, নিছক পেছনে লাগা। বিশেষ করে মহিলামহলে হাসির ফোয়ারা তোলার জন্যে যথেষ্ট উপযোগী আড্ডা এগোচ্ছে, স্বভাবতই গানবাজনার কথা উঠলো – আমাদের নিজেদের ইন-হাউস জারিজুরি সযত্নে জাহির করিয়ে দেবার পর মামা ধরে পড়লেন – "সৌমিত্র, এবার তো তোমার পালা, একটা গান হতেই হবে ।"

মা'র সামনে মামা "ধূম্রপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক" আপ্তবাক্যটি মেনে চলেন ।

"আচ্ছা পেরুদা, সবাই মিলে গাইলে হয় না – অনেকেই তো আছেন। কি বলো সবাই – কোন গানটা হতে পারে ?" সৌমিত্রদার আবেদন ।

"আগুনের পরশমণি"তেই বেশী ভোট পড়ল, সৌমিত্রদা আমাদের বিলিতী পিয়ানোটার সামনে বসে পড়ে সুর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমবেত কণ্ঠে গানটা সুন্দর ভাবেই আরম্ভ হোল, লিড গায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। সুরে তালে গানটা ভালই এগোচ্ছিল কিন্তু বিপত্তিটা নামলো – "আমার এই দেহখানি তুলে ধরো ..." তেই । পিয়ানো ছেড়ে হঠাৎই

হাতজোড় করে অরুণাদির সামনে বসে পড়ে নাটকীয়ভঙ্গীতে কেঁদে ফেললেন সৌমিত্র – "প্লী ... জ, মাপ করুন দিদিমনি, আপনার এই ভার আমি কিছুতেই তুলে ধরতে পারব না, কিছুতেই না"। পরের কয়েকটা মিনিটের বেসামাল হাসির ফোয়ারার মধ্যেই মুখে আঁচল দিয়ে দ্রুত প্রস্হান আমার মা'য়ের।

"তোমার একেবারে প্রথমদিকের – মানে কি ভাবে ছবিতে এলে সৌমিত্র ? কবিতা, আবৃত্তি, নাটকে তোমার পপুলারিটি তো জানি আমরা ।" সুষমা মাসিমার সাদামাটা প্রশ্ন ।

"ওরে বাবা, সে তো অনেক ঘটনা। আসলে কি জানেন মাসীমা ? সিনেমার থেকে ঐ সাহিত্য, পত্রিকা সম্পাদনা, কবিতা, রাজনীতি, যোগ ব্যায়াম, খেলাধূলোর দিকটাই আমাকে বেশী টানতো। আমার প্রথম স্ক্রীন টেস্টই বলতে পারেন – "নীলাচলে মহাপ্রভু", আমি তো ডাহা ফেল করেছিলাম"। অত্যন্ত সাধারণ ভাবেই স্বভাবসিদ্ধ স্নিগ্ধ হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলে দিলেন, যেন খুবই মজার কথা। "আর অল ইন্ডিয়া রেডিওতে ? ওখানে ঘোষকের চাকরীটা পেতাম না কি ? পেলাম তো অনিলদা (চ্যাটার্জি) ছবিতে ডাক পেয়ে চলে যাবার পরে"।

অননুকরণীয় বিনয় – মানুষের হৃদয় গলাতে আর কতটা প্রাণের উত্তাপ লাগে ?

পরের দিন ভোরসকালে রোজকার মতই আমি টু-ইন ওয়ানটা নিয়ে দক্ষিণ খোলা বারান্দাতে চায়ের আমেজে – সৌমিত্রদা এসে বসলেন, হাল্কা হলুদ টি শার্টে সেই তরোয়াল চেহারা আমার আজও মনে গেঁথে আছে। চায়ের কাপে কথাবার্তা চলছে । সামনে আমাদের লনের বাইরেই রাস্তাঘাট দিয়ে লোক চলাচল হচ্ছে – বুঝতেই পারছি বাড়ীর সামনে সবারই গতি থমকে যাচ্ছে, দৃষ্টি আমাদের দোতালার বারান্দায়। সাহসী, উৎসাহী স্কুল কলেজের মেয়েরা হাসিমুখে হাতও নাড়াচ্ছে। অলস দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে সোজা চোখ রেখে আজকের কিংবদন্তী স্বাভাবিক স্বরেই বললেন – "অম্লান , জামশেদপুরে তোমার ফ্যানসংখ্যা তো কম নয় দেখছি।" কার মুখে কি ঠাট্টা শুনছি !! তখন আপামর বাঙালী – "অপুর সংসার", "সমাপ্তির আবেশ", "সাত পাকে বাঁধা"র দাম্পত্যকলহের রেশ আর দেবীর আবেগের রসে মিলে মিশে জবজবে হয়ে গেছে – সেই অপু, এবারে আমার মুখের দিকে সরল মুখভঙ্গি করে একবার তাকিয়েই সিলিং এর দিকে দুষ্টুমির চাপা হাসিটা মুক্ত করে দিলেন ।

আমার হাতের গরম চা' টা ছলকে উঠে টেবিলক্লথটাকে জবজবে করে দিল ।

এবারে কিন্তু কয়েকটা বছর একটু ফাস্ট ফরোয়ার্ড না করলে একঘেয়েমির দোষে পাঠকদের রোষে পড়তে হবেই । জাভা সুমাত্রার দূর দ্বীপবাসিনী ..... সুমন্দভাষিণীদের দেশে প্রায় দুই দশক কাজের ঘোরে কাটিয়ে কোলকাতায় নোঙর করেছি বছর দুয়েক । ফোনে হঠাৎ আমার স্কুলের বন্ধু, ইংল্যান্ড প্রবাসী ডাক্তার শান্তিপ্রিয় মিত্রের গলা – "কি রে ব্যাটা, কি করছিস বাড়ীতে, কোন রিহার্সাল বা সাহিত্যসভা চলছে না কি ?" সত্যিই আমি ওসব নিয়েই বেশ ব্যস্ত থাকতাম কোলকাতায় এলে ।

"না না, আপাতত ..."

"চলে আয়, চলে আয় – সৌমিত্রদা আসছেন"। সৌমিত্রদার সঙ্গে শান্তি আর গোপার (সেও ওখানে ডাক্তার) ঘনিষ্ঠতা ছিল লন্ডনে – নাটক, ছায়াছবি, ওয়ার্কশপ এসব নিয়ে, সেই সূত্রেই কোলকাতায ওনার সঙ্গে দেখাশোনা ওদের। প্রতিবছরের মতো শীতের আগে ওরা কোলকাতায় এসেছে ।

সৌমিত্রদা ? ... ঢেউটা চোখের পলকেই পঞ্চাশ বছরের সীমারেখা ভেঙ্গেচুরে গুঁড়িয়ে দিয়ে সপাটে বসুভবনের আলোকোজ্জ্বল ঝলমলে সেই সন্ধ্যের চালচিত্রের মধ্যে আছাড়ে ফেললো – মনের আলোয় ভেসে এলো ছিপছিপে অপু, হাফ শার্ট আর ধুতি।

"সৌমিত্রদা কেমন আছো ? চিনতে পারছো ?" ঘরে ঢুকে দরজার পাশের সোফাটাতে বসে গৌরকান্তি, পরিণত, সৌম্যদর্শন, সফল, সার্থক এক কিংবদন্তী। খ্যাতির শিখরে শিখরে অনায়াস পদক্ষেপে বহু চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে ফুলেভরা রঙীন দ্বীপে – সোনার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত প্রশান্ত ছবি। চিনবেন আশা করাটা একেবারেই বাতুলতা ।

চেনা অচেনার দোলায়িত চাউনি দেখেই বুঝলাম মিথ্যে মিষ্টি বলে কথা ঘোরাবার লোক নন উনি ।

"মনে পড়াটা সম্ভব না জানি – অনেক বছর তো হোল। জামশেদপুর ... পেরুদা ?"। হাল্কা ভুরুদুটো উঠলো আকাশপথে, সুপরিচিত চোখের অতল দৃষ্টিতে স্মরণের আলো জ্বালিয়ে অবিস্মরণীয় হাসি ভেজা গলা ছলকে বেরিয়ে এলো – "ও – ও, বসুভবন ? নীহার মাসীমা ?"

দীপার সাগ্রহ সংযোজন – "পেরুদা ? পেরুদা কেমন আছেন ?"

শুরু হোল আমাদের নতুন করে যোগাযোগের অধ্যায়। লেকগার্ডেন্স, সল্টলেক, গল্ফক্লাব, আমাদের বালীগঞ্জ প্লেসের সীমিত আবাসে অথবা উপছে পড়া কোন প্রেক্ষামঞ্চের সাজঘরে কখনো কখনো দেখা এবং গল্পগুজব চলতো – ছায়াছবি বা নাটক সম্পর্কিত আলোচনাকে খুব একটা প্রাধান্য না দিয়েই ।

এসবের মধ্যে, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে সৌমিত্রদার খুব একটা অগ্রাধিকার দেখি নি কখনও – বাঙালী ভাত মাছের ঝোলই মনে হয় বেশী আকর্ষণীয় ছিল। সেদিন শান্তিদের বাড়িতে খেতে বসেছি – রীতা আমাকে বললো "ছ্যাঁচড়াটা খেয়েছ ? একটু নাও, খুব ভাল হয়েছে"। পাশেই সৌমিত্রদা, রীতাকে বল্লাম "আগে সৌমিত্রদাকেই ছ্যাঁচড়া দাও না"। খাওয়া থামিয়ে গম্ভীর মুখে বলে উঠলেন "না না অম্লান, আমি জাতপাতে বিশ্বাসী নই, তবু নিজের জাত আমি পাতে নিই না।" মানে – সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, "ছ্যাঁচড়া" সম্প্রদায়ের মানুষ ? হাসির হিল্লোল সেদিন নিশ্চয়ই লেক গার্ডেন্সের রাস্তায় এলোপাথাড়ি ঢেউ তুলেছিল ।

আর এক দিন । বিজ্ঞাপন সংস্কৃতির কথা চলছিল। উনি বিশেষ কোম্পানীর একটা হিয়ারিং-এড এ যুক্ত ছিলেন – যথাসম্ভব খোঁজখবর নিয়েই । বললেন – "অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করতেন – সৌমিত্রবাবু, আপনি যখন বলছেন তখন নিশ্চয় ভালই হবে, আমার বয়স্ক বাবার জন্যে নেওয়া যাবে তো ?" আমি বলতাম "দেখুন মশাই, বাজারে তো অনেক রকমের মডেলই বেরিয়েছে, আপনি বরং আপনার ডাক্তারকেই কন্সাল্ট করে নিন ।"

আরেক দিন – এক ভদ্রমহিলা, হাইলি সোফিস্টিকেট স্বর – "মিঃ চ্যাটার্জি, কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব। আপনার কথামত ঐ যন্ত্রটা কিনে আমার স্বামীর যে কি উপকার হয়েছে – সব কথা এখন পরিস্কার শুনতে পাচ্ছেন"। আমার যে এটাতে কোন হাতই নেই সেটা বললে তো উনি বিশ্বাস করবেন না, আমি ভগবানকেই ধন্যবাদ জানাতে বললাম। কেউ কেউ আবার সেরকম চটজলদি কাজ না হওয়াতে আমাকে শাসানীও দিয়েছেন। কোর্ট কাছারীর ভয় দেখিয়েছেন অনেকে।"

শোনার ব্যাপারে একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। একদিকের কানে ওনার শোনার একটু সমস্যা ছিল। খোলাখুলিভাবে উনি বলতেন "আমি তো স্টুডিওতে সব কলাকুশলীদের বলে দিই – এই শোন, তোমরা যা বলবে এদিকে এসে বোল, না হলে আমি কিন্তু বুঝতে পারব না।"

বন্ডেল রোডে এক বাড়ীতে নৈশভোজন, বেশ কয়েকজন আমন্ত্রিত। একটা ফোন কল নিতে নিতে দরজা দিয়ে ঢুকতেই শংকরদার গলা (সবার প্রিয় মণিশংকর মুখোপাধ্যায় – আমাদের খুবই কাছের মানুষ, রঙ্গরসিকতায় বেশ দক্ষ) শুনলাম "এই যে, সদাব্যস্ত কর্পোরেট সি ই ও সাহেব এলেন। ফোন আর অতি ব্যস্ততা ছাড়া তো এনাকে দেখাই যায় না ।" খাঁটি, অকৃত্রিম লজ্জার হাসি হেসে ফোনটা পকেটে নিয়েই বসে পড়লাম। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর সৌমিত্রদাকে

বললাম "আজ তাড়াতাড়ি এলে কি করে – শ্যুটিং ওয়ালারা ছেড়ে দিল ?" তিনটে চেয়ার দূর থেকে গোলমালের মধ্যে বোধহয় একটু অস্পস্ট শুনলেন । একেবারে সাদামাটা মানুষের মতই চেয়ারটা ছেড়ে সামনে থেকে আর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সোজা আমার পাশেই বসে পড়লেন – "হ্যাঁ , এবার বলো – ওখান থেকে ঠিক শুনতে পাচ্ছিলাম না ।"

কি অসাধারণ সাধারণ মানুষ – কত সহজে কত নীচে এসে আমার মত একটা ধূলিকণার সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন। অভিভূত আমি, শ্রদ্ধার ভারে মাটিতে মিশে গেলাম। এত সরল, নিরহঙ্কার, নম্র, বিনয়ী প্রতিভা ভাবতে পারা যায় ?

একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম "সৌমিত্রদা, অনেকেই নিশ্চয় জানে, তবু – সত্যজিৎ রায় তোমার ওপর এত ভরসা করেন, তা "নায়কের" মত একটা নায়কপ্রধান চরিত্রে তোমাকে নিলেন না ?"

একটু আশ্চর্য হয়ে অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে নিঃসংকোচে বললেন "আরে অম্লান – জানো না ? বাংলাদেশে "নায়ক" বললে লোকে একজনকেই বোঝে।" একটু থেমে নাটকীয় উচ্চারণে শেষ করলেন – "উত্তমকুমার" ।

"আমি তো গুপীর চরিত্রেও বাদ পড়েছি। আমার চেহারা চাষার ছেলের চরিত্রে একেবারেই মানাবে না। আমার বন্ধু সুবীর হাজরা ওনার খুবই প্রিয় ছিল । সে আগ বাড়িয়ে বলেছিল, "কেন, মেক আপ করিয়ে নিন না মাণিকদা ?"

মুখে কোনরকম ভাঁজ না ফেলে সোজা ওর দিকে তাকিয়ে মাণিকদা বলেছিলেন "আমাদের এখানে বড় সড় কোন মেক আপ হয় না – জানো না ?" চরিত্রের ন্যাচারাল অ্যাপিয়ারেন্সের ব্যাপারে উনি অসম্ভব চুজি ছিলেন ।

"আচ্ছা – ওঁর সঙ্গে তোমার প্রথম দিককার কথা তোমার মুখ থেকে খুব শুনতে ইচ্ছে করে সৌমিত্রদা"

"হ্যাঁ, ওনার সঙ্গে আগে একবার দেখা হয়েছিল ছোট অপুর ব্যাপারে। কিছুদিন পর একদিন সুবীর কফি হাউসের আড্ডায় এসে বললো – "তোকে মাণিকদা একবার যেতে বলেছেন, কিছু ভাবছেন বোধহয় তোকে নিয়ে।" গেলাম, নানা রকম কথাবার্তা হোল – ইংরাজি বাংলা ছবি, নাটক, শিশির ভাদুড়ী, সাহিত্য, সমকালীন উপন্যাস – পরে বুঝেছিলাম, সেটাই বলতে গেলে আমার স্ক্রীন টেস্ট ছিল ।

তখন উনি জলসাঘর, পরশপাথর নিয়ে ব্যস্ত। আমাকে স্টুডিওতে নিয়ে গেলেন একদিন। বোধহয় চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার জন্যেই। আমি তখন বিভোর হয়ে ছবি বিশ্বাসকে চোখ দিয়ে গিলছি। শ্যুটিঙের ফাঁকে মাণিকদা আমাকে ছবি বিশ্বাসের বিশাল ব্যক্তিত্বের সামনে বলে বসলেন – "এই যে, এ সৌমিত্র চ্যাটার্জি, আমার পরের ছবি অপুর সংসারের অপু" ।

আমার সেই মুহূর্তর মনের অবস্হা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। চোখে কাঁপছে ইন্দ্রলোকের স্বপ্ন, নিস্কম্প আলোর হাতছানি। কি করে যে স্প্রিংএর মতো সপ্তমস্বর্গে লাফিয়ে ওঠার চাপটাকে দমন করেছি, ভাবতে পারবে না।"

আড্ডায় থাকলে মাঝে মাঝে দীপাও কুট্টুস কাটুস করে ফুট কাটতো। একদিন আমাকে লোকজনের সামনে লজ্জায় ফেলে দিয়েছিল ।

"সতেরো তারিখে এলে না কেন ? তোমাকে মিস করেছি দীপা" । বলেছিলাম আমি ।

ফট করে বলে বসল "আমাকে তো আর পারসোনালি ডাকো নি অম্লান, তোমাদের তো শুধু দাদাকে হলেই চলে যায় " ।

কিম্বা, ওদের বিয়ের আগে দেখাশোনার ব্যাপারে – মেজদি জিজ্ঞেস করেছিল "আচ্ছা দীপা, তুমি সৌমিত্রকে নেট করলে কি করে – ব্যাডমিন্টন কোর্টে ?"

"কে, আমি ? জিজ্ঞেস করো তো ওকে, কে লেডি ব্রাবোর্ণের আশে পাশে ঘুর ঘুর করতো বিকেল থেকে ? আর দেওঘরে কেন ছুটেছিল আমরা যখন সপরিবারে ওখানে গিয়েছিলাম ?" এসব অবশ্য আগেকার কথা, তখনও দীপা চ্যাটার্জি অনেক সচল ছিলেন ।

মধ্যে একবার সৌমিত্রদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম "সত্যজিতবাবুর চরিত্র নির্বাচনে তোমার কখনও কোন প্রশ্ন ছিল না সৌমিত্রদা ?" উত্তরটা তো মোটামুটি জানাই আমার ।

সজোরে একটা ধাক্কা অসহায়ভাবে সামলে ওঠার অভিনয় করে বললেন "বলো কি , ওনার ভাবনার ওপরে কথা ?" একটু চুপ করে থেকে, বোধহয় বলাটা উচিত কি না ভেবে নিয়ে বললেন "হ্যাঁ, একবার বলেই ফেলেছিলাম "ঘরে বাইরেতে" আমাকে নিখিলেশের চরিত্রটা না দিয়ে সন্দীপের মত একটা সেমি ভিলেন করলেন মাণিকদা ?"ওনার চরিত্রানুযায়ী একটা ভদ্রগোছের এক্সপ্লোশন আশা করছিলাম । নাঃ – বরং একটু হেসে সিগারেটে একটা মাপা টান দিয়ে বললেন, ঠাট্টা করেই কি না জানি না – "দেখো, তুমি হচ্ছো সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় – দর্শকেরা তোমাকে এরকম একটা অনায়কোচিত চরিত্রে নেবে ?" ওনার মনের আসল ভাবটা কিন্তু আমি জানতে পারি নি, আর চেষ্টাও করি নি কখনও।

আর এখন ? আমরা চেষ্টা করলেও খুঁজে পাবো না তোমার ঐ উজ্জ্বল প্রাণবন্ত নির্ভীক অসাধারণ হয়েও সাধারণ শিল্পীসত্ত্বাকে যার অশেষ সৃষ্টি তো অবশ্যই, আমি আরো হারালাম বিশেষ কিছু মুহূর্তে সঙ্গে থাকা এক অকপট সাথী – আমাদের সৌমিত্রদাকে। আজ বিষাদের পাহাড় ফাটিয়ে নামছে একটা একটা করে হীরের টুকরো কাঁচকাটার তীব্রতা নিয়ে, স্মৃতির পর্দা বেয়ে। উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক মহাশূন্যে মিলিয়ে গেলেন, ক্ষণিকের দ্যুতিতে আমাদের প্লাবিত, আন্দোলিত, সম্মোহিত করে । সামনে নয়নজলে ধোয়া মহাকালের পটভূমিতে পড়ে থাকলো তাঁর অসাধারণ সৃষ্টিরাশি আর অনন্তের উদ্দেশ্যে তাঁর নিষ্ক্রমনের পদচিহ্ন – বুকের কেন্দ্রবিন্দু থেকে সরে যাচ্ছে দূরে, দূরে, আরো দূরে ... বহুদূরে ।

আর ... এই শুকতারা মুহূর্তগুলি এক আলোর মালায় গেঁথে মণিকোঠায় তুলে না রাখার অপরাধে প্রতিটি ক্ষত আজ আঁচড়াচ্ছে আমায় ।

সৌমিত্র চক্রবর্তী

সৌমিত্রের চোখে সৌমিত্র

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা মোটামুটি আমার জন্মের পরেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। আমার মা ছিল সৌমিত্রর অন্ধ ভক্ত। কাজেই নিজের পুত্রসন্তানের নামকরণ সে তার প্রিয় নায়কের নামেই করে ফেলেছিল। ওনার সঙ্গে আমার দ্বিতীয় সম্পর্ক স্থাপন হল যখন আমার বন্ধু গোপালের ঠাকুমা 'দত্তা' ছায়াছবিতে ডাক্তারের ভূমিকায় সৌমিত্রকে দেখে মুগ্ধ হলেন ও নামের মিলের সুবাদে আমাকেও ডাক্তার সম্বোধন শুরু করলেন।

ওনাকে চাক্ষুষ দেখা অবশ্য প্রথম কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে মা-র সঙ্গে 'নামজীবন' ও 'রাজকুমার' নাটক দেখতে গিয়ে যদিও সে বয়সে নাটকের কিছুই বুঝিনি, কাজেই কোনো মুগ্ধতাও তৈরি হয়নি।

মুগ্ধতা প্রথম সৃষ্টি হল বি ই কলেজের রিইউনিয়নে, তাও অভিনয় দেখে নয়, আবৃত্তি শুনে। রবীন্দ্রনাথের তোতাকাহিনী পাঠ করেছিলেন সৌমিত্র, তার একদম শেষদিকে খসখস শব্দটা এতো সুন্দর করে বলেছিলেন যে সেই শিশু বয়সেও মনে হয়েছিল আবৃত্তি কি সুন্দর ও স্বর্গীয়। বলতে দ্বিধা নেই, পরবর্তী জীবনে কয়েকশো বার চেষ্টা করেও অমন খসখস উচ্চারণ করতে পারিনি।

তারপর ফেলুদা সিরিজ হয়ে একের পর এক তাঁর অভিনয় দর্শন, একেবারে হাল আমলের 'সাঁঝবাতি' অথবা বসু পরিবার অবধি। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ সময়েই মুগ্ধতা মন ছেয়ে গেছে। একই সঙ্গে সুকুমার বৃত্তির বিভিন্ন বিভাগে অনায়াস পদচারণা বিস্মিত করেছে।

উত্তম কুমারের সঙ্গে সৌমিত্রের একটা তুলনামূলক আলোচনা চিরকালই চলে এসেছে যা আমার কাছে নিতান্ত অবান্তর ঠেকে। প্রথমতঃ, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিরাট একটা সময়সীমা ধরে অভিনয়ের যে সুযোগ সৌমিত্র পেয়েছেন, স্বল্পায়ু উত্তম তা পাননি। বৈচিত্রের দিকে যাত্রা শুরু করতে না করতেই তিনি বিদায় নিয়েছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, দুজনের ইমেজ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা গোত্রের। উত্তম ছিলেন "আমাদের পাশের বাড়ির ছেলেটাকে যেভাবে দেখতে চাই 'আর সৌমিত্র' আমাদের পাশের বাড়ির ছেলেটা আসলে যেমন"। প্রথমটায় কল্পনার ভাগ বেশী, দ্বিতীয়টা মাটির একটু কাছাকাছি। তবে আমার মনে হয় ম্যাটিনি আইডল হতে গেলে যা লাগে, সৌমিত্রর মধ্যে তার খামতি ছিল, বুদ্ধিমান তিনি তাই ও পথ দিয়ে সেভাবে হাঁটতেই যাননি। তাঁর অবশ্য আরেকটা অতিরিক্ত সুবিধা ছিল, সত্যজিতের নিয়মিত শিল্পী হওয়ার। এখানেও দেখবেন স্বাভাবিক চরিত্রগুলো সৌমিত্রর ভাগে পড়লেও নায়কের মতো লার্জার দ্যান লাইফ চরিত্রের জন্য উত্তমের দরকার পড়েছিল। মোদ্দা কথা, এ' তুলনা অবান্তর ও বোকামি।

সৌমিত্রর একটি বড় পাওনা বোধহয় এই যে তাঁর অভিনীত বেশীরভাগ বিখ্যাত সিনেমা হয় উচ্চ সাহিত্য থেকে নেওয়া অথবা উচ্চ মানের পরিচালকের হাতে তৈরি। কাজেই অথর-ব্যাকড চরিত্র সৌমিত্র যে পরিমাণ, ব্যাপ্তি ও সময়সীমা জুড়ে পেয়েছেন, তা বাংলা সিনেমায় খুব কম মানুষের জুটেছে বা জোটে। এর কৃতিত্ব অবশ্যই তাঁর নিজেরই প্রাপ্য কারণ তিনি নিজস্ব অভিনয় শৈলী দিয়ে এর যোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। একটা সময়ের পরে কিছু কিছু চরিত্রে সৌমিত্র একমেবাদ্বিতীয়ম ছিলেন, তাতে তাঁকে হয়তো অভিনয়ের পুনরাবৃত্তির একঘেয়েমির শিকার হতে হয়েছে, কিন্তু লাভবান হয়েছেন দর্শক ও পরিচালকেরা কারণ যে কোনো দক্ষ অভিনেতার মতোই সৌমিত্রও একঘেয়েমির মধ্যে বৈচিত্র্য আনতে পারতেন অনায়াস দক্ষতায়। সৌমিত্রর প্রতিভার পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়নি এ' যেমন সত্য, ঠিক তেমন এ' কথাও অনস্বীকার্য যে তিনি যতটা সুযোগ পেয়েছেন, সেটাও অনেকটাই এবং দুর্লভও বটে। আর তাই সৌমিত্রর চারপাশে

একটা সফল প্রাতিষ্ঠানিকতার দ্যুতি লক্ষ্য করা গেছে বারবার, বিশেষ করে শেষের দিকে, যা একদিকে যেমন বাঙালির সাংস্কৃতিক শ্লাঘাকে তুষ্ট করেছে, অন্যদিকে নিঃসন্দেহে মানুষ ও তারকা সৌমিত্রকে পরিতৃপ্তি জুগিয়েছে।

এহেন সৌমিত্রর প্রতি আমার মনে অবশ্য অনুযোগও আছে দুয়েকটা। যেমন, উত্তম পরবর্তী বাংলা সিনেমা ইন্ড্রাস্ট্রির ধ্বস তিনি সামলাতে পারেননি। এখানেও কারণ বোধহয় এই যে সর্বজনগ্রাহ্য কোনো স্বপ্নের নায়কের ইমেজ তাঁর ছিল না যা মেইনস্ট্রিম সিনেমার পক্ষে প্রয়োজনীয়। আরেক অনুযোগ এই যে ওই সময় থেকে গোটা নব্বই দশক তিনি একের পর এক অবান্তর ও একঘেয়ে বাবা-কাকার রোল করে গেছেন তখনকার বাংলা সিনেমার প্যাটার্নে গা ভাসিয়ে, কিন্তু নতুন ধারার সূচনা করতে চাননি বা পারেননি। অন্যধারার ছবিতে অবশ্য ততদিনে তিনি অপরিহার্য যা আমৃত্যু তাঁকে দিয়ে ভালো ভালো সব চরিত্র করিয়ে নিয়েছে। আসলে সেই সময়ে বাংলা সিনেমায় শৈল্পিক সিনেমা ও বাজারি সিনেমার বিভাজনটা এতো আড়াআড়ি ছিল যে শহুরে শিক্ষিত দর্শক, যারা সৌমিত্রর ফ্যান বেস, বাংলা মেইনস্ট্রিম সিনেমা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। আর মেইনস্ট্রিম সিনেমা দেখছিলেন তাঁরাই যাঁদের কাছে সৌমিত্রর চেয়ে পোসেনজিতের (প্রসেনজিৎ-এর নয়) স্টার ভ্যালু বেশি ছিল। কাজেই সব মিলিয়ে সৌমিত্র নিজেকে টিঁকিয়ে রাখতে অকিঞ্চিতকর সব রোল করে গেছেন জীবিকার দায়ে, হয়তো বা অভিনয়ের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসাতেও। এখানে একটা কথা বলি। ভারতীয় সিনেমার কোনো বড় স্টারই খুব বেশি মনে রাখবার মতো কাজ করবার সুযোগ পাননি। উত্তম কুমার কিংবা অমিতাভ বচ্চন – সবাই যত ছবি করেছেন, তার দশ পনেরো শতাংশের বেশী ছবি কিন্তু আমাদের মনে দাগ কাটেনা। সৌমিত্রর করা শ' তিনেক ছবির মধ্যে তিরিশটার বেশী ছবি একবারে আমরা কেউই মনে করতে পারব কি ?

তাঁর সঙ্গে আমার একমাত্র সাক্ষাৎ ও আলাপচারিতা ২০১২ সালে আমার এক অগ্রজের বাড়িতে। খুব বেশী যে কথা হয়েছিল তা নয়, তবে তাঁর ভদ্রতাবোধ ও নিজেকে ক্যারি করবার মুন্সীয়ানা মনে ছাপ ফেলেছিল। আসলে ওনার চোখেমুখে ও কথাবার্তায় এমন এক স্পষ্ট বুদ্ধির ছাপ থাকত যে মুগ্ধ না হয়ে পারা যেতনা। বিভিন্ন ইন্টারভিউতেও তা লক্ষ্য করেছি। বিদগ্ধ মানুষ বলতে যা বোঝায়, তাই। তাঁর চলে যাওয়া সেজন্যই বাংলা সিনেমার বেশ বড়মাপের ক্ষতি, আক্ষরিক অর্থেই।

ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায়

সৌমিত্র স্মরণে

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে প্রথম দেখি রূপোলি পর্দায়। সে বহু বছর আগের কথা। আমার বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখতে গিয়েছিলাম সত্যজিত রায়ের ছবি "অপুর সংসার"। আমি তখন নেহাতই একটি ছোট মানুষ। সিনেমার গল্প, ঘটনা সমূহ কিছুই বোধগম্য হয় নি তখন। শুধু মানসপটে আঁকা হয়ে গিয়েছিল অত্যন্ত রূপবান, দীর্ঘকায় একটা মানুষের ছবি। মুখের অনেকখানি অংশ দাড়ি-গোঁফে ঢাকা। অবিন্যস্ত চুল। চওড়া কপাল। মুখাবয়বে বিশেষ আকর্ষণীয় জ্বলজ্বলে, বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ। মানুষটির নাম ছিল অপু। তার কাঁধের ওপর বসেছিল একটি শিশু। নিজের দুই হাত তুলে তাকে আঁকড়ে ধরেছিল অপু। অজানার সমস্ত সংশয়, দ্বিধা এবং ভয় কাটিয়ে শিশুটি অপরিচিত অপুকে "বন্ধু" বলে মেনে নিয়েছিল। সেই মুহূর্তে, নিঃসঙ্কোচে, নির্দ্বিধায় সে তার বন্ধুর সঙ্গে কলিকাতা পাড়ি দিতে প্রস্তুত হয়েছিল। তার বিশ্বাস ছিল কলিকাতা গেলে তার বাবার দেখা মিলবে।

তারপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে গেঁথে থাকা সেই ধোঁয়াটে ছবিটা নানা সূত্র থেকে প্রাসঙ্গিকতার ছোট ছোট টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে ফুটিয়ে তুলেছিল এক সম্পূর্ণ, সার্থক ইমেজ। সেই ইমেজের বিষয় তো সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অবশ্যই ছিলেন – কিন্তু তখন খেয়াল করেছিলাম যে তাঁর দুই চোখে, হাসিতে এবং মুখাবয়বে ছায়া ফেলেছেন একাধারে রবীন্দ্রনাথ আর যীশুখৃষ্ট! আর কি অপূর্ব সেই ছবির অভিব্যক্তি!

আজও আমার মানস-চক্ষে সজীব আছে সেই ছবি। থাকবেও, আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন।

আমার শৈশব অতিক্রম করে কৈশোরে এবং কৈশোর পেরিয়ে প্রথম যৌবনে সৌমিত্রর কয়েকটি ছবি দেখেছিলাম; অতল জলের আহ্বান, ঝিন্দের বন্দী, প্রস্তর স্বাক্ষর, মণিহার, ক্ষুধিত পাষান। এখনও মনে পড়ে যায় "ক্ষুধিত পাষাণ" ছবিটির একটি দৃশ্যে তাঁর উন্মুক্ত প্রাণখোলা হাসি।

তারপর প্রথম যৌবনকালে বাসস্থান এবং গোত্র পরিবর্তন করে আমি অস্ট্রেলিয়াতে চলে আসি। সেই সব দিনে, বিশ্ব জুড়ে ইন্টারনেটের অবাধ আনাগোনা ছিল না। প্রযুক্তিও আজকের মত এতখানি অগ্রসর ছিল না। তাই বাংলার সাহিত্য, সংস্কৃতি, চলচ্চিত্র এবং নাট্যজগতের কোন খবর সেভাবে পেতাম না। এক রকম নির্বাসিত জীবনই কাটিয়েছিলাম অনেকগুলো বছর।

তাই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর mentor (মেন্টোর) সত্যজিৎ রায়ের যুগলবন্দী যে দর্শকদের চৌদ্দটি ফীচর ফিল্ম উপহার দিয়েছিল তা আমার জানাই ছিল না! এছাড়া নানা নির্দেশকের তৈরি বিভিন্ন বিষয়ের ছবিতে অভিনয় করে তিনি যে দর্শকদের প্রিয় নায়ক হয়ে উঠছিলেন, নাট্যজগতেও দ্রুত এগিয়ে চলেছিলেন খ্যাতির শীর্ষে তার আভাস আমি বহুকাল পাই নি। তবে খবর পেয়েছিলাম তাঁর একাধিক পুরস্কার প্রাপ্তির। এর মধ্যে ছিল পদ্মভূষণ, ন্যাশনাল ফিল্ম অওয়ার্ড, দাদাসাহেব ফাল্কে অওয়ার্ড এবং ফরাসী সরকার-প্রদত্ত Order des Arts et des Letters পুরস্কার। ফরাসী সম্মানটি তিনি পেয়েছিলেন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং পরম্পরার ক্ষেত্রে তাঁর প্রভূত অবদানের সুবাদে।

তারপর অবশেষে একদিন সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম অভিনয়-জগতের এই তারকার। তখন তিনি শুধু অভিনেতাই নন, একজন কবি, বাচিক শিল্পী আর গ্রন্থকারও।

২০০৮ সালের শীতে আমরা ক্যানবেরা গিয়েছিলাম অস্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় সরকার আয়োজিত একটি কলচরল

এক্সচেঞ্জের অনুষ্ঠানে। অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিকের নৃত্য-পরিবেশনার পর, প্রায় একঘন্টার ওপর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। উদাত্ত কণ্ঠের আবেগ জড়ানো সেই আবৃত্তি দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল সারাটা ক্ষণ। আর উল্লেখনীয় যেটা ছিল তা হল, স্টেজে ওঁর পাশের টেবিলে স্তূপীকৃত একরাশি কবিতার বই – অথচ আবৃত্তিকালে কোথাও আটকে গিয়ে একটিও বই খোলার প্রয়োজন হয় নি তাঁর। প্রতিটি কবিতা তাঁর আদ্যপ্রান্ত মুখস্থ ছিল।

সৌমিত্রর সঙ্গে লেখিকা। – ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া

অনুষ্ঠানটি শেষ হবার পর, আমরা স্থানীয় এক বন্ধু, তপন কুন্ডুর আমন্ত্রণে তাঁদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। সৌমিত্র এবং কোয়েল মল্লিককে ঘিরে একটি ক্ষুদ্র অথচ জমজমাট সান্ধ্য আসর এবং এলাহি খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করেছিলেন তপন কুন্ডুর স্ত্রী স্বপ্না। আমন্ত্রিতদের সংখ্যা সাত-আট জনের বেশী ছিল না। সেখানেই রূপোলি পর্দার সেই নায়ককে দেখি। প্রাণবন্ত, কৌতূকপ্রবণ, হাস্যময় এবং বিদগ্ধ একটি মানুষ, সেই সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত যিনি আমার কাছে শুধু কিংবদন্তী হয়েছিলেন। প্রথম দেখায় আমার মনে হয়েছিল সারা দেহে নেমে আসা বার্দ্ধক্য যেন ওঁর ব্যক্তিত্বকে এক ধরনের নতুন জৌলুস দিয়েছে। এই দেশের লোকেরা হয়ত একেই বলে growing old with elegance and dignity.

সেই ঘরোয়া জমায়েতে আমন্ত্রিতদের সংখ্যা খুব বেশী না থাকায় সৌমিত্রর পাশটিতে বসে কথা বলার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। কিন্তু সুযোগ পেয়েও ভারি ধন্দে পড়ে গিয়েছিলাম আমি। ভাবছিলাম, বলবটা কি?

ততদিনে ওঁর সম্বন্ধে অনেক কিছু পড়েছি এবং জনমুখে অনেক কিছু শুনেছি – যথা, তিনি শিল্পী পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে শিল্পী অভিনেতা হিসাবে এক দুর্লভ জুটি। বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তিনি যেভাবে নিজের অভিনীত চরিত্রগুলিকে খুঁটিয়ে দেখেন তা অতি বিরল। সমস্যা-সঙ্কুল জীবনের ভারে তলিয়ে না গিয়ে, জীবনের সঙ্গে মোকাবিলা করার দৃঢ়তা-সম্পন্ন এক মানুষ – ইত্যাদি, ইত্যাদি। তাই কোলকাতা-প্রাঙ্গনে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে সচল সেই মানুষটির সঙ্গে ওঁর বহুচর্চিত জীবন ও কার্যকলাপ নিয়ে কথা বলতে যাওয়াটা আমার নিরর্থক মনে হল।

অতএব, কি বলি, কি বলি! খানিকক্ষণ ভাবতে হল আমাকে। সহসা মনে ভেসে এলো বহু বছর আগে, আমার কলেজ জীবনে পরিচিত একটি মেয়ের কথা। দময়ন্তী সুবেদার। এক মারাঠি মেয়ে। এলাহাবাদ (অধুনা প্রয়াগরাজ নামে সর্বজন বিদিত) বিশ্ববিদ্যালয়ে সে ছিল আমার সহপাঠিনী। ছোট্টখাটো, মিষ্টি একটি মেয়ে যে সেই সময়ে আমাদের স্টেট উত্তরপ্রদেশের লেডিজ টীমকে অন্তর-রাষ্ট্রীয় ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে রিপ্রেসেন্ট করত। সেই দময়ন্তী একবার কোলকাতা গিয়েছিল এরকমই একটি টুর্নামেন্টে। সেখান থেকে ফিরে এসে, একদিন কলেজে লাঞ্চটাইমে সে আমাকে একটা গ্রুপ ছবি দেখিয়ে বলেছিল, দেখো তো চিন্তে পারো কি না! সেই ছবিতে আমি শুধু দময়ন্তীকে চিনেছিলাম আর

চিন্তে পেরেছিলাম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে। ওঁর কাছে শুনেছিলাম, সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গীয় উইমেন্স টীমের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন টূর্নামেন্টে ওকে খেলতে হয়েছিল দীপা চ্যাটার্জীর সাথে। সেই সময়ে দীপা চ্যাটার্জীই ছিলেন পশ্চিম বঙ্গের লেডিজ ব্যাডমিন্টন রিপ্রেজেন্টেটিভ। এবং সেই সূত্রেই দীপার স্বামী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ওদের খেলোয়াড়দের গ্রুপ ফটোতে সামিল হয়েছিলেন।

কথাটা মনে পড়তেই সৌমিত্রর কাছে দময়ন্তী সুবেদার এবং ওই গ্রুপ ফোটোর কথা উল্লেখ করেছিলাম। এবং ভারি আশ্চর্য হয়েছিলাম তাঁর প্রতিক্রিয়া দেখে। অত বছর পরেও দময়ন্তী, তার সঙ্গে ওঁর স্ত্রী দীপার টূর্নামেন্ট খেলা এবং পরে গ্রুপফোটোতে খেলোয়াড়দের সঙ্গে দাঁড়িয়ে তাঁর ছবি – সব কিছুই স্পষ্ট মনে ছিল সৌমিত্রর।

দময়ন্তীর সূত্র ধরে এরপর বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা এগিয়ে চলেছিল আমাদের। উনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন দময়ন্তী এখন কোথায় আছে এবং কেমন আছে ? কোন সুরাহা হয়েছে কি ? উনি ঠিক কি জানতে চাইছিলেন বুঝতে পারি নি তখন, তাই বলেছিলাম ওর সম্বন্ধে আমার আর কিছুই জানা নেই। কমপ্লিটলি আউট অফ টচ।

তার কয়েক বছর পর জানতে পেরেছিলাম দময়ন্তীর জীবনের অনেক ঘটনা। জনমুখে আরও শুনেছিলাম যে আমার সেই প্রাক্তন সহপাঠিনী পরপর তিনবার রাষ্ট্রীয় মহিলাদের সিঙ্গল ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়নশিপ জয় করেছিল। এবং তখনি খবর পেয়েছিলাম যে ১৯৭০ সালে দময়ন্তী বিবাহ করে ফ্লাইট লেফেটনেন্ট বিজয় বসন্ত টাম্বে নামে এক মারাঠি ফাইটর পাইলটকে। কিন্তু বছর দেড়েকের মধ্যেই তাদের জীবনে ঘোর দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে। বাংলা দেশ স্বাধীনতার জন্য ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধে বিজয় টাম্বেকে অ্যাকশনে যেতে হয়। তারপর ৫ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল থেকে আর তাঁর কোন হদিশই পাওয়া যায় নি। শোনা যায় তিনি নাকি যুদ্ধবন্দী হয়ে পাকিস্তানের কোন জেলে বসে আছেন এতগুলো বছর। ভারত সরকার তেমন কিছুই করতে পারেন নি অদ্যাবধি।

যাই হোক, ক্যানবেরা শহরে সৌমিত্রর সঙ্গে আমাদের সেই ঘরোয়া আসরে, কিছুক্ষণ পরই গৃহকর্ত্রীর হাতের যাদুতে টেবিল ভরে গিয়েছিল বিভিন্ন রকমের সুস্বাদু রান্নাবান্নায়। কচ্চি চিকেন বিরিয়ানী, কষা মাংস, চিংড়ি মাছের মালাই কারি, মুগের ডাল, আলু পোস্ত, বেগুন ভাজা, চাটনী, পাঠিসাপ্টা, রসমালাই – কি ছিল না টেবিলে সেই সন্ধ্যায় ! সুগৃহিনীর রান্নার উচ্ছ্বসিত প্রশংসার ফাঁকে ফাঁকে সৌমিত্রও তাঁর অভিনয় দক্ষতা, উদাত্ত কণ্ঠ, সুপুরুষ চেহারার শ্লাঘা শুনছিলেন হাসিমুখে। একজন বলেছিলেন, "আপনার হাসিটা কিন্তু বদলায় নি। ঠিক আগের মতনই আছে।"

আর একজন বলেছিলেন, "আপনি এখনও এমন সুন্দর। স্লিম অ্যান্ড ফিট।"

উত্তরে তিনি কৌতূকের হাসি হেসে বলেছিলেন, "ঘরে-বাইরে, আমি আসলে ঘাড়ের এক্সর্সাইজটা খুব করি"।

– "মানে? মানে? মানে?" ওঁর দুই পাশ থেকে গুঞ্জন উঠেছিল।

– আমাকে সুস্বাদু খাবার দাবার খেতে পীড়াপিড়ি করলেই আমি মুহুর্মুহু ঘাড় নেড়ে ঘোর আপত্তি জানাই আর সেই সব খাবার অস্বীকার করি।

এইভাবেই নানা গল্প-গুজবে, হাসি-কৌতূকের মধ্যে কেটে গিয়েছিল সেই সন্ধ্যেটা।

এরপরেও কয়েকবার কোলকাতা গিয়েছিলাম। স্টেজে ওঁকে দেখেছিলাম নীলকণ্ঠ, হোমাপাখি, কিং লিয়রে অভিনয় ক'রতে – কিন্তু ওঁর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ আর হয় নি। যদ্দূর আমার মনে পড়ে, কিং লিয়র নাটকে রাজা লিয়রের আদ্যপ্রান্ত সংলাপ ওঁর মুখস্থ ছিল। কোন প্রম্পটারের সাহায্য ছাড়াই তিনি দিব্যি চালিয়ে গিয়েছিলেন ঘন্টা তিনেক-ব্যাপী সেই নাটকে নিজের ভূমিকা। নাটকের শেষে সৌমিত্রর আশীতম জন্মদিন পালন করা হয় স্টেজে।

২০২০ সালের পুরোটাই করোনা-আক্রান্ত একটা সময়ের মধ্যে আচম্‌কা ঢুকে পড়ল সারা বিশ্ব। সৌমিত্রও আক্রান্ত হলেন শুটিং করতে গিয়ে। বেলভিউ হাসপাতালে চল্লিশটি দিন যমের সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি যুদ্ধ চলল অতঃপর। পরাজয় তাঁকে স্বীকার করতে হল শেষমেশ। ১৫ই নভেম্বর তিনি ইহলোক ত্যাগ করে চলে গেলেন।

লেখিকার স্বামী, সৌমিত্র এবং লেখিকা – ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া

শুধু চলচ্চিত্র অভিনয়ের ক্ষেত্রেই নয়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় পশ্চিম বাংলার প্রশস্ত সাংস্কৃতিক রঙ্গমঞ্চেও চলে আসতে পেরেছিলেন অনায়াসে তাঁর চলচ্চিত্র অভিনেতা সত্ত্বা পেরিয়ে। রঙ্গমঞ্চ, রূপোলি পর্দা, ছোট পর্দা এবং বিনোদনের জগতে তাঁর ছিল সমান আধিপত্য এবং কমিটমেন্ট। এছাড়া কবি হিসেবেও প্রভূত সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন বাংলা কাব্যজগতে।

গত ২রা ডিসেম্বর ২০২০র "দেশ" পত্রিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে ঘিরে তাঁর ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীর অনেকেই তাঁর স্মৃতি-চারণ করেছেন। বলেছেন সৌমিত্রের সান্নিধ্যে কাটানো তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা। এবং করেছেন নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সৌমিত্রর দীর্ঘকালব্যাপী কর্মকান্ডের ব্যাখ্যা।

সহজ হাসি হেসে যেন উত্তমকুমারকে বলতে পারেন, নায়ক হয়ে থাকা এক রকমের তৃপ্তি আর সুধীন্দ্রনাথের কবিতার মতো – "তুমি নিয়ে চলো আমাকে লোকান্তরে। তোমাকে বন্ধু আমি লোকায়তে বাঁধি" – এ আর এক রকমের তৃপ্তি। গত বিশ বছর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে আমরা সেভাবেই দেখেছি। থিয়েটারে সিনেমায় শেষটুকু দিয়ে যেতে হবে, এই যেন তাঁর তিতিক্ষা। . . . (শেখর সমদ্দার)

পায়েল সেনগুপ্ত তাঁর "সাহিত্য চেতনায় স্ফুরিত" লেখাটিতে মন্তব্য করেছেন,

". . . এমন কি নিজের অভিনীত চরিত্রগুলোকে সাহিত্যস্রষ্টাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং অভিনয়ের দিক থেকে প্রায়ই তিনি বিশ্লেষণ করেছেন এক দূরদর্শীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতায়।"

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় তাঁর "বিদায়শিল্পী"তে সৌমিত্রর স্মৃতিচারণের উপসংহারে বলেছেন

"তাঁর অন্তিমপর্ব হয়তো আরও বিধুর হতে পারত। এই শহরে ঘনিষ্ঠ চাঁদের নীচে চোখ আর চুলের সংকেতে কোনও মেধাবিনী, রূপবান এই অর্ফিউসকে টেনে নিয়ে যেতে পারত গহন অন্ধকারে। তা হয়নি। এ জনপদে আরোগ্য-নিকেতন আছে। অন্তিম নাচের কোনও প্রথা নেই। সুতরাং ইতিহাস ও ঈশ্বরের কাছে নায়ককে ফিরতে হল একাকী।"

আজ জানি না তিনি কোথায় আছেন। কেমন আছেন। কিন্তু মনে বিশ্বাস রাখি যে যেখানেই থাকুন তিনি খুব ভালই আছেন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

জয়ন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়

দেখা

এত উজ্জ্বল ও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, যেন 'প্রথম আলো' আমার সারা অস্তিত্বকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে। যদি ভাবেন যে এ ত এক মামুলি ভ্রমণকাহিনী অথবা পদার্থ বিজ্ঞানের কচকচানি, তাহলে বলব ভুল। হয়ত বা চমকপ্রদ কোন সিনেম্যাটিক উপকরণ পাবেন আমার রম্যরচনায়। ভূমিকা ছেড়ে আসি আসল কথায়। আমি সদ্যপ্রয়াত আপামর বাঙালীর একেবারে নিজস্ব অথচ বিশ্ববন্দিত 'পুলুদা' ওরফে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলছি। তাঁর সঙ্গে একাধিক প্রত্যক্ষ কথোপকথনগুলোর বয়স প্রায় সিকি শতাব্দী হতে চলল, অথচ সম্প্রতি চোখের ছানি সরানোর পরে পরিষ্কার দেখতে পাওয়ার আনন্দে যেরকম ভেসেছিলাম, আজ ঠিক সেভাবে মনের ফিরে পাওয়া স্বচ্ছতা আমাকে ওই অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখতে উৎসাহিত করছে।

মাস দুয়েক আগে আমার বাঁচোখের ছানিটি নির্মূল হয়েছে। পলিমাটির মত এক একটি আস্তরণ সরিয়ে দেবার পর বুঝতে পারছি আমার দেখাকে কতখানি বিকৃত ও ঝাপসা করছিল ওই পাণ্ডুর আবরণ। লিখতে বসে পাঁচ বছর আগের স্মৃতিও বুদ্বুদের মত ভেসে উঠছে, যেদিন হঠাৎ জানতে পেরেছিলাম যে ডানচোখের রেটিনা বিচ্ছিন্ন হতে আর দেরী নেই ও ছানিও বেশ ভালই পড়েছে। ডাক্তারবাবু দু'খানা অস্ত্রোপচার করে আমার রেটিনা সেলাই ত করলেনই, ছানিও তুলে দিলেন। তারপর যা বললেন, আমি তার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আমার চোখে একটা গ্যাসের বুদ্বুদ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং রেটিনার সংযুক্তি সুরক্ষিত করার জন্য কিছুদিন আমাকে মাথা নীচু করে রাখতে হবে। এরপর দু'সপ্তাহ ধরে অসাধারণ চলচ্চিত্র দেখেছিলাম আমার সদ্য সার্জারি করা চোখের মধ্যে। শুধু আমি ছিলাম দর্শক। চোখের মাঝে বড় বুদ্বুদটা ভেঙে অনেকগুলো ছোট বাচ্চার জন্ম হচ্ছিল। কয়েকদিন পরে আমার একঘেয়েমি দূর করার জন্য নতুন বন্ধুরা একটি সুন্দর কানের রিং উপহার দিল – রিংয়ের নীচের দিকে ছোট্ট ছোট্ট বৃত্তগুলো দিয়ে তৈরী তাদের ডিজাইনের তারিফ না করে পারি নি। মাসখানেকের মধ্যে বুদ্বুদরা আমাকে অব্যাহতি দিয়েছিল এবং ডানচোখের দৃষ্টি সুরক্ষিত ও স্বচ্ছ হয়ে ওঠে।

আমি যে কী করে বোঝাব আমি কী অনুভব করছিলাম! আমার অ্যামেরিকান কলিগকে বললাম, 'যদি সত্যজিৎ রে আমার এই অনুভূতির বর্ণনা শুনতেন, তিনি অবশ্যই পিকচারাইজ করে দেখিয়ে দিতেন যাতে দর্শকের চোখে পরিষ্কার ফুটে ওঠে আমি কী দেখছি অথচ আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না।' এই কলিগের রে-অনুরাগ আমার অজানা ছিল না। তিনি 'চারুলতা'র হাতে দূরবীন নিয়ে এক জানালা থেকে আর এক জানালায় যাওয়ার বিখ্যাত দৃশ্যকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র সৃষ্টি বলে মনে করেন। সত্যজিতের 'মানসপুত্র' আখ্যা পেয়েছিলেন যিনি, সেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রায় পঁচিশ বছর আগে বেশ কয়েকবার অমূল্য সময় কাটানোর সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ওই স্মৃতিবিন্দুগুলোকে কখনো সাক্ষাৎকার মনে করিনি। মহান শিল্পীর স্মরণে তাই আমার নিজস্ব চিন্তাধারায় লিখছি, যেন চোখে অন্তরীণ ওই বুদ্বুদগুলোর মত, তারাও আমার একান্ত আপন। মিলিয়ে গেলেও তারা আজও আমার মনে উজ্জ্বল।

বাংলা চলচ্চিত্রের দিকপাল অভিনেতাদের স্ক্রীনে দেখেছি অন্য সব বাঙালীদের মতই; তবে অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সে। রক্ষণশীল পরিবারে 'বড়দের' সিনেমা দেখা বারণ থাকাতে শুধু মহাপুরুষদের জীবনীমূলক এবং দেশাত্মবোধক ছবি দেখারই পার্মিশন ছিল হাইস্কুল পর্যন্ত। তবে বিকেলবেলা বেড়াতে বেড়াতে উত্তম-সুচিত্রার ছবির গল্প শুনতাম চোখ কান খাড়া করে বাল্যবান্ধবী নুপুরের (পোশাকী নাম অনুশ্রী, আন্তর্জাতিক পত্রিকা বাতায়ানের স্রষ্টা) কাছে। ভাগ্যবতী নুপুর (নামের বানান ওরই তৈরী) মা-মাসীর সঙ্গে ছবি রিলিজ করার সপ্তাহেই দেখে নিত আর আমরা ওর কথকপটুতার

ফল উপভোগ করতাম। বেশী অনুযোগ করার আগে বলে রাখি, বাবা অবশ্য 'হাটারি', 'দ্য বার্ডস', 'সাউন্ড অফ মিউজিক' দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। স্পষ্ট মনে আছে, '৭০ দশকের শুরুতে মেসোমশাই ভালবেসে কলেজ আরম্ভ করার পুরস্কার হিসেবে 'হারানো সুর' দেখালেন। সিনেমা হলে মহানায়ক-মহানায়িকার প্রেম দেখব, না মেসোমশাইয়ের সুচিত্রা-উত্তম প্রেম দেখব বুঝতে পারছিলাম না। এরপর 'নবরাগ' দেখে আমিও যেমন উত্তমে দিশেহারা হয়েছি, তেমনি সৌমিত্রের অভিনয় মুগ্ধ করেছে 'চারুলতা', 'বাঘিনী', 'অপুর সংসার', 'অভিযান'-এর মত ছবি দেখে। মনে পড়ে, শরৎবাবুর লেখনী, অজয় করের সুনিপুণ পরিচালনা, মৌসুমীর মিষ্টত্ব – এসবের সংমিশ্রণে তৈরী 'পরিণীতা' ১৯৬৯-এ রিলিজ করল। বছরখানেক পর দেখতে গিয়ে এই ষোড়শীকে কিন্তু পাগল করে দিয়েছিল 'শেখর'এর চলচ্চিত্ররূপ দেওয়া অভিনেতার রূপ আর অভিনয়। তখন কল্পনাও করিনি যে রুপোলী পর্দার ওই রাজপুত্র ভবিষ্যতে আমার সামনে বসে তাঁর অমূল্য অভিজ্ঞতার গল্প করবেন।

ঘটনাচক্রে এরপর সারা পরিবারের সঙ্গে আমার বাসস্থান বদলে গেল দশহাজার মাইল দূরে এক নতুন দেশে – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। পড়াশোনা, বিবাহিত জীবন, সন্তানপালন – দিন, বছর কেটে যাচ্ছিল ব্যস্ততার মাঝে। '৯৪ অথবা '৯৫ সালে পি এইচ ডি প্রোগ্রামের ক্লাসের মাঝে গরমের ছুটিতে দেশে এলাম একটু ব্রেক নিতে। ছেলের তখন এমন একটা বয়স যে তার বাবার কাছে রেখে আসাই যায়; সে নানারকম খেলাধূলার ক্যাম্প, প্র্যাক্টিস ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত। প্রিয় মাস্তুত দিদি বীথির আমন্ত্রণে ওর বাড়িতে দু'সপ্তাহ কোথা দিয়ে যে কেটে গেল! গল্প, আড্ডা, সিনেমা, জলসা, বাইরে খাওয়া – একেবারে মুক্ত বিহঙ্গ। দিদি তার অজান্তে বোনের পাগলা প্যাশন জাগিয়ে দিল উত্তমকুমার নামে এক মহান শিল্পীর রুপোলী পর্দায় একাধিক সৃষ্টির ম্যাজিক দেখিয়ে। নতুন শাড়ির লোভকে ফুৎকার দিয়ে উড়িয়ে বিদেশে বসে বিশ্লেষণ করার জন্য ৩০-৩৫টা ভিডিও ক্যাসেট ঢুকে গেল স্যুটকেসে। এরই মাঝে একদিন হঠাৎ সুযোগ পেলাম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়-পরিচালিত ও অভিনীত 'টিকটিকি' দেখার, দিদির বাড়ির কাছেই মধুসূদন মঞ্চে। বেশ রোমাঞ্চ হচ্ছিল সিনেমার সেই 'শেখর'কে স্বচক্ষে দেখতে পাব ভেবে।

দেখলাম। না, এখানে 'টিকটিকি'র বিবরণ দেব না। ওই নাটকের সাফল্য অবিসংবাদিত। মন্ত্রমুগ্ধ নিশ্চয় হয়েছিলাম নবাগত কৌশিক সেনের ও তাঁর অগ্রজপ্রতিম পরিচালকের অনবদ্য অভিনয় দেখে। কিন্তু আজ অন্য একটি স্মৃতিবিন্দু স্পর্শ করছে মনের বৃত্তে, ঠিক ওই চোখের ভেতর ঢোকানো গ্যাসে ভরা বুদ্বুদগুলোর মত। সবাই যখন নিবিষ্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ সীনে, সব মনোযোগ খান্খান হয়ে গেল একটি শিশুর বিকট চিৎকারে। অর্বাচীনের মায়ের তাকে চুপ করানোর অসফল প্রচেষ্টা প্রায় একমিনিট ধরে চলল। সৌমিত্রবাবু তখন মঞ্চে নিশ্চল, ওই তরুণীর প্রতি তাঁর শীতল তীব্র চাহনিই তাকে বাধ্য করল বাচ্চাটিকে নিয়ে হল ছেড়ে বেরিয়ে যেতে। পরমুহূর্তে দুই অভিনেতা ঠিক যেখানে থেমেছিলেন, সেখান থেকেই আবার আরম্ভ করলেন, যেন কিছুই হয় নি। তাঁর আন্তরিক পেশাদারিত্ব সেদিন পরিষ্কার ফুটে উঠেছিল আমার চোখে। দর্শককে তিনি এতটুকুও ঠকান নি, চেঁচান নি, স্ক্রিপ্ট-ভিন্ন এমন কোন শব্দ উচ্চারণ করেন নি যাতে নাটকের প্রভাব নষ্ট হয়। রাগের বশে তিনি যদি বিরক্তিপ্রসূত একটিও মন্তব্য করতেন, দর্শকের পক্ষে গল্পে ফিরে আসা কঠিন হত। তাঁর এই ইম্প্রেসিভ প্রফেশনালিজমের নমুনা ভবিষ্যতেও বারেবারে পেয়েছি।

দু'বছর পরের কথা। আবার দিদির আতিথেয়তা উপভোগ করছি গরমের ছুটিতে এসে। ততদিনে উত্তমকুমারের অদম্য জীবনীশক্তি, হার স্বীকার না করার জেদ আমাকে বড়ই আকৃষ্ট করেছিল। 'ফ্লপমাস্টার জেনারাল' আখ্যা থেকে 'মহানায়ক' – এই যাত্রাপথ সম্বন্ধে বিশদভাবে রিসার্চ করার আকাঙ্ক্ষা তখন প্রবল। কথায় বলে, কোন ইচ্ছা যদি আন্তরিক হয়, ঈশ্বর সমভাবাপন্ন মানুষদের সংযোগ ঘটিয়ে দেন। আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। কীভাবে অভিনেতা অরিন্দম শীলের (বর্তমানে বাংলার অন্যতম প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক) সঙ্গে হঠাৎ পরিচয় হল, সেই কাহিনি ভবিষ্যতের আর একটি আলোচনার জন্য তোলা থাক। আজ এইটুকুই বলি যে দূরভাষের মাধ্যমে তিনি আমায় জানালেন টালিগঞ্জের এন টি ওয়ান স্টুডিওতে যেন আমি পরদিন সকাল দশটায় পৌঁছে যাই। সৌমিত্র সারাদিন শুটিং করার জন্য ওখানে

থাকবেন এবং আমার সঙ্গে কথা বলতে রাজী হয়েছেন। ফোনটা রেখে দিদিকে জড়িয়ে ধরে কতটা ব্যতিব্যস্ত করলাম, বলাই বাহুল্য। যতই আকাঙ্ক্ষা থাকুক, দিদি সেদিন আমার সঙ্গ নেবার ইচ্ছে থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। ভীড় বাড়ালে যদি বোনের এই অভিনব সুযোগটা নষ্ট হয়ে যায়। যাবার আগে মনস্থির করেছিলাম যে প্রথম আলাপে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা নিয়েই আলোচনা করব। অভিনয় সম্পর্কে শেখার আশাও অবশ্যই ছিল।

ঠিকসময়ে যথাস্থানে পৌঁছে গেলাম। অরিন্দম আগেই বলে রেখেছিলেন বলে গেটে প্রবেশের অনুমতি পেতে অসুবিধে হল না। অনতিদূরের একটি ছোট সাদা রঙের বিল্ডিংয়ে মেকাপ নিয়ে বসে ছিলেন তিনি শটের অপেক্ষায়। পরিচয় দিলাম। তাঁর অভিব্যক্তি দেখে মনে হল, অ্যামেরিকার অনাবাসিক বাঙালী মহিলার খোঁপা বাঁধা, চাঁপা রঙের টাঙাইল শাড়ি ও চটি পরা চেহারা হয়ত বা তাঁকে কিছুটা অবাক অথচ আনন্দিত করেছিল। জানতে চাইলেন আমার অধ্যাপনার ও পি এইচ ডি-র বিষয়টা কী। সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন এসবের সঙ্গে আমার অভিনয়জগতের কৌতূহলের সম্পর্ক কোথায়। খুব বেশী ব্যাখ্যা করতে হয় নি তাঁর কাছে। নিজের অভিজ্ঞতার জোরে বুঝে নিলেন যে আমার কাছে ক্লাসে পড়ানোও একটা অভিনয়শৈলী, দর্শক কী চাইছে এবং কীভাবে এক্সপ্রেস করলে সবচেয়ে ভাল বোঝানো যাবে, এটা ছাত্রদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমার কলকাতার মঞ্চে ও চলচ্চিত্রে অভিনয় করার প্রচ্ছন্ন ইচ্ছের কথা জেনে পরিষ্কার বললেন, 'নিশ্চয় পারবে, তবে অনেক ত্যাগ স্বীকার করা চাই। এখানে এসে দীর্ঘদিন থাকতে হবে, শিখতে হবে, তবেই সম্ভব।'

জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর মতে মঞ্চে এবং পর্দায় অভিনয়ের মাঝে পার্থক্য কোথায়। এখানে বলে রাখি যে অভিনয়ের প্রতি তীব্র আকর্ষণ থাকায় একাধিক বই পড়েছিলাম এ বিষয়ে। কিন্তু আমার কাছে এই দিকপাল অভিনেতার উত্তর ছিল মৌলিক, কারণ আমি তাঁর সামনে বসে ছিলাম। ইন্টারনেটের কল্যাণে বর্তমানে এইরকম প্রশ্নের উত্তর সহজলভ্য। কিন্তু পঁচিশবছর আগে এ বিষয় শেখার উত্তম উপায় ছিল কোন পারদর্শীর কাছে, সশরীরে। আমার মত একজন আমজনতার একেবারে চোখের সামনে সেই সুযোগ, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। সৌমিত্রদা (ডাকটা তাঁরই প্রস্তাবিত) বললেন, – 'প্রধান পার্থক্য হল শরীরের ও মুখের পেশীচালনার মধ্যে। মঞ্চের দর্শক বসে থাকে কম করে ৩০ ফুট দূরে। তাই হাঁটতে হবে বড় পদক্ষেপ ফেলে জোরে জোরে, কথা বলার সময় ঘাড় ঘোরাতে হবে অনেকখানি বেশী যাতে একেবারে পেছনের সারির দর্শক পরিষ্কার দেখতে পায়। খালি চোখ ঘোরালে কেউ দেখতেই পাবে না। ডায়লগও বলতে হবে জোরে, প্রজেক্ট কোরে। ফিল্মের ব্যাপারটা একেবারে অন্যরকম। ক্যামেরায় প্রতিটি পেশীর চালনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ধরা পড়ে। তাই চোখ, মুখ, সারা শরীর খুব কম ও সূক্ষভাবে চালনা করে বোঝাতে হবে। মঞ্চের অভ্যাস না বদলিয়ে রুপোলী পর্দায় অভিনয় করলে স্বাভাবিক লাগবে না, বড় ড্রামাটিক মনে হবে। এই কারণে তুমি যদি ছবি বিশ্বাস, তুলসী চক্রবর্তী, বিকাশ রায়, উত্তমকুমারের আগের আমলের অভিনেতাদের পর্দায় দেখ, খুব নাটুকে মনে হবে।' তিনি বিবরণ দিতে দিতে মঞ্চাভিনয় করে দেখাচ্ছেন। প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। এরপর চলচ্চিত্র অভিনয়ের নমুনা দেখাবার জন্য আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন শুটিং ফ্লোরে। সেখানে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় তৈরী ছিলেন গৃহবধূর সাজে। সৌমিত্রদা সাদা ফতুয়া-ধুতি পরে পল্লীগ্রামের এক মধ্যবয়সী গৃহকর্তার রোলে নিখুঁত শট দিলেন। শুধু আমি নই, চারপাশের কলাকুশলীরা একবাক্যে এই দুই অভিজ্ঞ শিল্পীর অভিনয় প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁদের ছোট ছোট পেশী সঞ্চালন, চোখের মণি ঘুরিয়ে কথা বলা, সব মিলিয়ে কাজের মধ্য দিয়ে ফিল্ম অ্যাকটিং বর্ণনা করলেন। পরের বছর ঋতুপর্ণ ঘোষের 'অসুখ'-এর শুটিং দেখার সময়েও তাঁর ওইরকম সূক্ষ অভিনয় প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

এরপর ছিল লাঞ্চব্রেক। তাঁর অতিথি আপ্যায়ন উল্লেখযোগ্য। আমাকে তাঁর স্যান্ডউইচের অর্ধভাগ এগিয়ে দিলেন। আমি সলজ্জে 'খেয়ে এসেছি' বলাতে আশ্বাস দিলেন যে তাঁর জন্য তৈরী খাবার খাওয়া নিরাপদ এবং মোটা হবার ভয় নেই। এরপরে 'না' বলার সাহস আমার ছিল না। সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনার প্রসঙ্গে জানালেন যে তিনি দৃশ্য বোঝাবার পর অভিনেতাকে নিজের মত করে চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে স্বাধীনতা দিতেন। তাঁর মনোমত না হলে স্বল্পকথায় শান্তভাবে

আবার বুঝিয়ে শট নিতেন। সৌমিত্রদাকে তাঁর প্রিয় অভিনেতাদের বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। দেখালেন স্টুডিওর দেয়ালে টাঙানো কয়েক মাস আগে প্রয়াত রবি ঘোষের হাস্যময় ছবি। আমাদের সাক্ষাৎকার হয়েছিল জুন মাসের প্রখর গ্রীষ্মে, রবিবাবু শুটিং করতে করতেই সেই বছরের (১৯৯৭) ফেব্রুয়ারি মাসে হঠাৎ পরলোকগমন করেন। 'একেই বলে অভিনয়গত প্রাণ' – বুঝলাম একজন প্রকৃত বন্ধুর অভাব তাঁকে বড় বিচলিত করেছিল। উত্তমকুমার এবং তিনি নিজেও কিন্তু অভিনয় করতে করতেই আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। আরও বললেন যে তুলসী চক্রবর্তী তাঁর মতে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। মঞ্চাভিনয়ের হাতেখড়ি তাঁর হয় শিশির ভাদুড়ীর কাছে। এইরকম নানা বিষয়ে গল্প করতে করতে সেদিন চার-পাঁচ ঘন্টা যেন ফুৎকারে কেটে গেল। বিদায় নেবার আগে তাঁকে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াবার ইচ্ছাপ্রকাশ করলে সানন্দে রাজী হলেন। অকপটে জানালেন উৎকৃষ্ট whiskey-র প্রতি অনুরাগ। আমরা দুজনেই কথা রেখেছিলাম।

দিন পনেরো পরে জুলাইয়ের একটা স্যাঁতসেঁতে বিকেল। এর মধ্যে আমি নুপুরের (সেই কথকশিল্পী) সাদর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ওর নিউ আলিপুরের বাড়িতে দু'সপ্তাহ ধরে ওর আদর যত্নে আর গল্পগুজবে বেশ মশগুল হয়ে আছি। অরিন্দমের হঠাৎ ফোন। দু'দিন বাদে শুটিংয়ের পর রাত ন'টা নাগাদ তাঁরা আসবেন আমার রন্ধনের গুণ পরীক্ষা করার জন্য। ওই সময় ফরাসি পরিচালক ক্যাথারিন বার্জ সৌমিত্রদার জীবন নিয়ে 'গাছ' তথ্যচিত্র তৈরী করছিলেন যা রিলিজ করেছিল পরের বছর ১৯৯৮ সালে। সুদক্ষ গৃহিণী নুপুর আধঘন্টার মধ্যে মেনু ঠিক করে রান্নার সরঞ্জাম কেনাকাটার সব ব্যবস্থা করে ফেলল। ও বানাবে ফিস্ ফ্রাই আর ঝিরিঝিরে আলুভাজা, আমি ঠিক করলাম ফ্রাইড রাইস, নারকোল কুচি দিয়ে ঘন ছোলার ডাল আর মসলা পনীর (আমার নিজের রেসিপি) বানাব ক্যাপ্সিকাম দিয়ে। এতবছর কেটে গেছে। অথচ লিখতে বসে প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি – আমার উপর নুপুরের খবরদারি, whiskey কিনতে গিয়ে বন্ধুপতির খুনসুটি, রজনীগন্ধার স্তবক দিয়ে ঘরটির সৌন্দর্য বাড়ান, ইত্যাদি। এই প্রস্তুতির মাঝে অনাবিল আনন্দের অণুরণন আজও কানে বাজে। রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ আমাদের অতিথিরা এলেন। সারাদিনের পরিশ্রমের পরেও আমার আকাঙ্ক্ষা মেটাতে তাঁরা দ্বিধা করেন নি। সৌমিত্রদার দিনের শেষে রিল্যাক্স করার জন্য whiskey খেতেন ভালবেসে, তবে ঠিক দু'পেগ, তার এক চিলতেও বেশী নয়। খুশী হলেন তাঁর অনুরোধ রেখেছি বলে। 'ছোলার ডাল

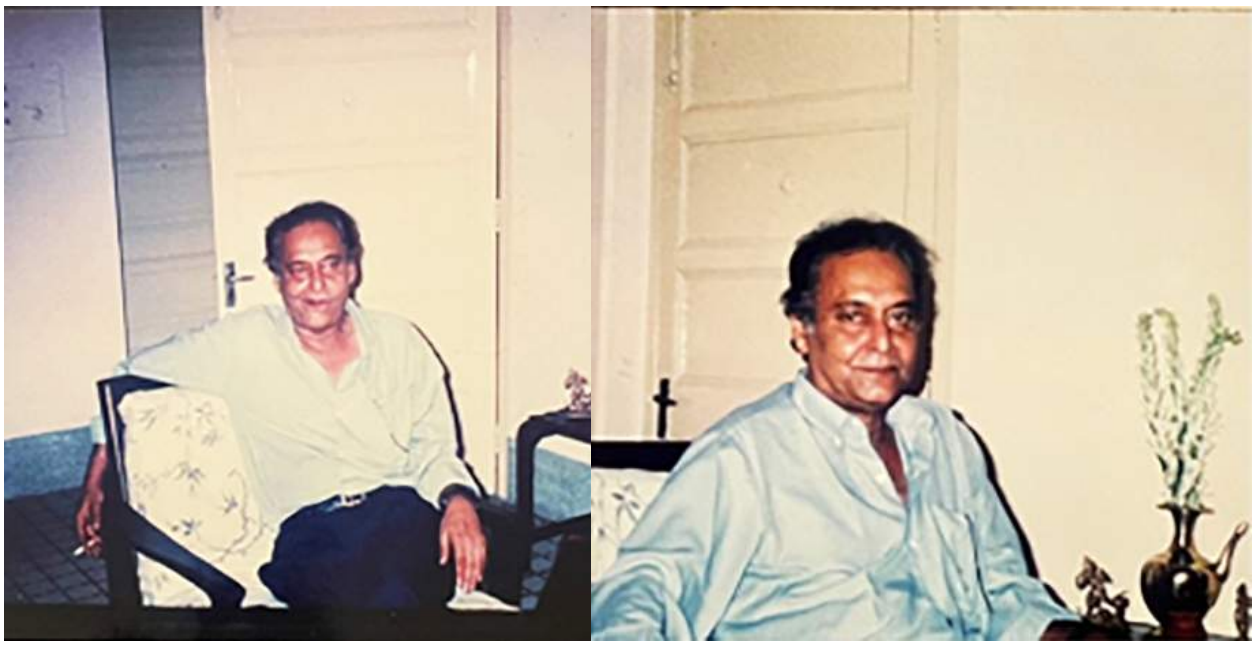

নুপুরের বাড়িতে আড্ডা

তুমি করেছ? বিদেশিনীর হাত তো পাকা। যে এমন রাঁধে, সে ত অভিনয়েও পটু হবে।' তাঁর প্রশংসায় আমার মুখ 'উঠল রাঙা হয়ে।' স্বপ্নের নায়ক বসে আছেন সামনে, ষাটোর্ধ, কিন্তু তখনও কী সুঠাম, আকর্ষণীয় চেহারা! বোঝাই যায় নিয়মিত ব্যায়াম করা, খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধে অতি সাবধানী। শার্টের দু'তিনটি বোতাম খোলা, ফ্যানের হাওয়ায় চুল সামান্য উড়ছে, হাতে সিগারেট, নায়কোচিত মেজাজে বসে গল্প করছেন। এই প্রৌঢ় আর সাতাশ বছর আগে '৭০ সালে দেখা যুবক 'শেখর'-এর মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ করি নি।

এবার আর সুযোগ ছাড়লাম না। মহানায়কের সঙ্গে অভিনয় করার অভিজ্ঞতা নিয়ে বলতে অনুরোধ করলাম। শোনা যায় যে নামীদামী হয়েও তিনি অত্যন্ত ভদ্র, অমায়িক, তবে উত্তমকুমারের প্রতি নাকি একটা প্রচ্ছন্ন পেশাদারী অসূয়া আছে। আমার তা মনে হয় নি। তিনি 'অপরিচিত' ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করার প্রসঙ্গে বললেন, 'তাঁর হাসি এমন ছিল যে আমিও প্রেমে পড়েছিলাম। রঞ্জন, এক বড়লোকের কুসন্তানের রোলে তাঁর অভিনয় অনবদ্য, নিখুঁত হয়েছিল। বাড়ির বড়দাদা বা বড়কর্তার রোলেও তিনি পুরো ন্যাচারাল কারণ ওঁর বাস্তবজীবনও ওইরকম। বেঁচে থাকলে আমরা দু'জনে বৃদ্ধদের বিভিন্ন রোল করে তোমাদের অনেক উঁচুমানের ছবি উপহার দিতে পারতাম। সত্যজিৎ রায় ছাড়া তাঁর অভিনয়ক্ষমতাকে পরিচালকেরা বোধহয় ঠিকমত exploit করেন নি। তাঁর star value-কেই exploit করা হয়েছে।' এই উত্তরের মধ্যে পরশ্রীকাতরতার চেয়ে অব্যক্ত শ্রদ্ধাই লুকিয়ে ছিল।

সন্ধ্যার আড্ডা সমাপনের আগে আমার শেষ প্রশ্ন, 'পর্দায় আপনাদের কন্ফিডেন্স দেখে জানতে ইচ্ছা হয় যে কতদিনের অভ্যাসে এরকম ন্যাচারাল হওয়া যায়।' প্রশ্নটা বেশ পছন্দ হয়েছে মনে হল – 'দেখ, প্রফেসর, তোমায় একটা গল্প বলি। আমি একবার জঙ্গলে ছবি তুলতে গিয়ে হঠাৎ এক বাঘের দেখা পাই। আমার সৌভাগ্য যে শার্দূলটি আমাকে দেখতে পায় নি। আমি ত পাথর, নড়াচড়া করতে পারছি না। দুই পা ঠকঠক করে কেঁপে হাঁটুগুলোতে ঠোকাঠুকি লাগছে। বাঘের হাত থেকে সেদিন রেহাই পেলেও ওই ভয় পাবার অনুভূতি কোনদিন ভুলব না। এটুকু বুঝলাম যে খুব বড় শিকারীও যদি বলে যে বাঘ দেখে তার ভয় করে না, জানবে যে সে মিথ্যে কথা বলছে। সেইরকমই যত বড় অভিনেতাই হোক না কেন, সে যদি কখনও বলে যে স্টেজে দর্শকদের সামনে যেতে তার আর ভয় করে না, সেও সত্যিটা ঢাকছে। আমার দীর্ঘ তিরিশ বছরের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি যে অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ অভিনেতার পার্থক্য হল স্টেজে ওঠার আগে নার্ভাসনেস কন্ট্রোল করার ক্ষমতার মধ্যে। নতুন অভিনেতা মনে করে 'স্টেজে মেরে দেব', অথচ দর্শককে সামনে দেখেই সব ভুলে যায়। উইংসের ভেতরে আমার হাঁটুদুটো আজও ঠকঠক করে কাঁপে, কিন্তু স্টেজে একবার উঠলে ভয়ডরকে থুড়ি মেরে আমি পুরোপুরি সাবলীল। ব্যস, এইটুকুই তোমাকে বলতে পারি। বিদেশিনী, এবার আমায় উঠতে হবে, কাল ভোরে শুটিং আছে।' আজও তাঁর এই উপদেশের প্রতিটি শব্দ আমার মনের কোণে গাঁথা। গত ১৭/১৮ বছর ধরে বস্টনের 'সেতু' থিয়েটার গ্রুপে স্টেজে বিভিন্ন রোলে অভিনয় করেছি। উইংসের ভেতরে দাঁড়িয়ে সৌমিত্রদার মত ঠকঠক করে কেঁপেছি, কেউ গল্প করতে এলে ধমক দিয়েছি। কিন্তু দর্শকদের সামনে গেলেই আত্মবিশ্বাস খুঁজে পেয়েছি, ভয়ডর তখন একেবারে বেপাত্তা।

প্রায় বছর দেড়েক কাটল। আমি ততদিনে স্বরচিত গল্পের চিত্ররূপ দেব ঠিক করে ফেলেছি। পরিচালকের খোঁজে আবার টালিগঞ্জে পাড়ি। শুটিংয়ের ফাঁকে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন সৌমিত্রদা। দেখেই সেই 'বিদেশিনী' সম্বোধনে আপ্যায়ন। পুরো গল্পটা তাঁকে বললাম। মন দিয়ে শুনে একটিই মন্তব্য করেছিলেন, 'ভাল বই হবে, তবে ঠিকমত ট্রিটমেন্ট দরকার।' নানা কারণে আমার প্রযোজিত 'শেষ ঠিকানা' ছবিতে তাঁর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয় নি। প্রভাত রায় পরিচালনা করেছিলেন। যাইহোক, প্রসঙ্গান্তরে যাব না। ফিরে আসি তাঁর সঙ্গে আর এক অবিস্মরণীয় আলাপের কথায়। ছবি করা শেষ। সালটা ২০০০। আবার কলকাতার গরমে সেদ্ধ হচ্ছি, এমন সময়ে জীবনমুখী সঙ্গীতশিল্পী অজিত পাণ্ডের সঙ্গে তাঁর গান শুনতে যাবার আকস্মিক নিমন্ত্রণ পেলাম। গিয়ে দেখি সৌমিত্রদাও নিমন্ত্রিত। তাঁর অনিন্দিত কণ্ঠে 'বনলতা সেন' শুনে যখন মোহিত, আরও একটি বড় চমক আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। তাঁকে প্রণাম করতেই স্মিত

হেসে বললেন, ‘এই যে প্রফেসর, আজ কিন্তু তোমার কথা ভেবে বনলতা সেন আবৃত্তি করলাম।’ অবশ্যই আমি তখন বাক্যহারা। বারবার প্রমাণ করে দিয়েছেন, শুধু মহান শিল্পীই নন, তার চেয়েও কত বড় মাপের মানুষ ছিলেন। হাজার হাজার বিখ্যাত ও অখ্যাত লোকের সঙ্গে যাঁর দৈনন্দিন ওঠাবসা, আমার মত এক অতি সাধারণ মানুষকে প্রত্যেকবার দেখা হতেই মনে রেখেছেন, নিজের পরিচয় নতুন করে দিতে হয়নি। হয়ত আমার শিল্পীমনের অস্থিরতা তাঁর মনে কোথাও একটা দাগ কেটেছিল।

নুপুর অনেকদিন ধরে সৌমিত্রদাকে নিয়ে লিখতে বলেছে। কুঁড়েমি করে কিছুতেই লেখা হয়নি। গত নভেম্বরে সৌমিত্রদার প্রয়াণের পরে ফেসবুকে নীচের ছবিগুলো দিয়েছিলাম। ব্যস, এবার রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়ের সোজা বার্তা, ‘জয়ন্তীদি, লেখো।’ আমার মাথায় কী কী চিন্তা দানা পাকাচ্ছে জানাবার জন্য ওকে একাধিকবার ফোন করে বিরক্ত করেছি। এবার এল সুমধুর নির্দেশ, ‘এবার মগজ থেকে কাগজে ফেলো।’ আমার ‘দেখা’ সৃষ্টিতে প্রধান ভূমিকা নেবার জন্য ধন্যবাদ জানাই দু’জনকে।

১৯৯৭: স্টুডিওতে

আমার দুর্ভাগ্য যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মঞ্চ শেয়ার করতে পারিনি, কিন্তু আমার পরম সৌভাগ্য যে কয়েক মুহূর্তের জন্য তিনি আমার মাঝে ‘বনলতা সেন’-এর ছায়া দেখেছিলেন। আমার সেই অভিনব অনুভূতি কবিগুরুর লেখনীতেই প্রকাশ করি,

“এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর! পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর, সুন্দর হে সুন্দর।।
আলোকে মোর চক্ষুদুটি, মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি, হৃদগগনে পবন হল সৌরভেতে মন্থর, সুন্দর হে সুন্দর।।....”

সুদীপ্ত ভৌমিক

থিয়েটারের সৌমিত্র

কিছুদিন আগে প্রয়াত হয়েছেন বাংলার গর্ব, শ্রী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। কালের নিয়মে সবাইকেই একদিন চলে যেতে হয়, কিন্তু ওঁর চলে যাওয়ায় বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হল, তা পূরণ করা সহজ নয়। ওঁর মত বহুমুখী প্রতিভার মানুষ ইদানীং কালে খুব বেশি একটা দেখা যায়নি। চলচ্চিত্র জগতে ওঁর অবদান নিয়ে তো কোন প্রশ্নই নেই। শুধু বাংলা বা ভারতীয় সিনেমাই নয়, বিশ্ব চলচ্চিত্রে এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছেন এই অসামান্য অভিনেতা। ওঁকে নিয়ে, এবং ওঁর কাজ নিয়ে ইতিমধ্যেই অনেক লেখা লেখি হয়েছে, অনেক আলোচনা হয়েছে। সুতরাং আমার আর নতুন করে বলার কিছু নেই। তবু, ওঁর প্রতিভার যে দিকটা নিয়ে খুব বেশি আলোচনা হয়ত সেভাবে হয়নি, তা হল ওঁর বাংলা থিয়েটারে অবদান। আমি সেই বিষয়েই দুচার কথা আলোচনা করব।

প্রথমেই যে কথাটা বলা দরকার তা হল, আদ্যপান্ত থিয়েটারের মানুষ বলতে যাদের বোঝায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তাঁদের একজন। অথচ দুঃখের কথা হল, বাংলা থিয়েটারের মহীরূহদের কথা উঠলে সাধারণত যে সব নাম উঠে আসে, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম তাদের সঙ্গে উচ্চারিত হয় না। বাংলা থিয়েটারে ক্রমাগত অসংখ্য ভাল প্রযোজনা করার পরও তাঁকে আমরা কিছুটা দূরেই সরিয়ে রেখেছি। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রখ্যাত নাট্য (এবং চলচ্চিত্র) নির্দেশক সুমন মুখোপাধ্যায় সাম্প্রতিক একটি আলোচনায় বলেছেন, "এ হয়ত আমাদের গ্রুপ থিয়েটার জগতের এক ধরনের উন্নাসিকতা বা ব্রাহ্মণ্যবাদের ফসল। আমরা যারা গ্রুপ থিয়েটার করি তাঁরা হয়ত সাধারণ বা পেশাদার রঙ্গালয় থেকে উঠে আসা শিল্পীদের তাদের সমগোত্রীয় মনে করি না। কোথাও একটা বিভাজনের দেয়াল খাড়া করে তাদের ওপারে রেখে দিই। সৌমিত্রর ক্ষেত্রে আমরা হয়ত সেই কাজটাই করেছি।" কথাটা সত্যি ভাবার মত।

শিশির ভাদুড়ির শিক্ষায় শিক্ষিত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এক সময়ে সাধারণ রঙ্গালয় (পেশাদার বা বোর্ড থিয়েটার) এ কাজ করেছেন। শিশির ভাদুড়ির সঙ্গে সৌমিত্রর যখন প্রথম দেখা হয়, তখন শিশির ভাদুড়ির থিয়েটার জীবনের সূর্য অস্তগামী। ভাড়া দিতে না পারার জন্য "শ্রীরঙ্গম" থেকে ভাদুড়ি মহাশয় তখন কার্যত বিতাড়িত। সুতরাং শিশির বাবুর সঙ্গে বা তাঁর নির্দেশনায় প্রত্যক্ষ মঞ্চে কাজ করার সুযোগ হয়ে ওঠেনি কখনও। কিন্তু সৌমিত্র নিয়মিত তাঁর কাছ থেকে থিয়েটারের একান্ত পাঠ নিয়েছেন, এবং সেই মতোই নিজেকে তৈরি করেছেন। ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটে, গ্রন্থ জগত প্রকাশনার দপ্তরে সদ্য গড়ে ওঠা "নব্য বাংলা নাট্য পরিষদ" এর সাপ্তাহিক বৈঠকে শিশির ভাদুড়ির কাছে শিখেছেন কিভাবে নাটক পড়তে হয়, কিভাবে টেক্সটের প্রতিটি লাইন থেকে গোয়েন্দার মত খুঁজে নিতে হয় চরিত্রের নিভৃত সূত্র গুলি, আর তারপর কিভাবে তা প্রকাশ করতে হয় সংলাপ উচ্চারণ, প্রক্ষেপণ এবং শরীরী অভিনয়ের মাধ্যমে। গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে গড়ে না উঠেও গ্রুপ থিয়েটারের কমিটমেন্ট এবং ডিসিপ্লিন এই দুটোকেই তাঁর অভিনয় জীবনের অঙ্গ করে নিয়েছিলেন। অভিনয় জীবনের তুঙ্গে থেকেও, চলচ্চিত্রের ম্যাটিনি আইডল হওয়া সত্ত্বেও, সুমন মুখোপাধ্যায়, কৌশিক সেনের মত তরুণ নাট্য পরিচালকদের নির্দেশনায় কাজ করেছেন দলের আর পাঁচজন অভিনেতার মতোই – গ্রুপ থিয়েটারের সমস্ত ডিসিপ্লিন মেনে। সুমন, কৈশিক দুজনেই বলেছেন কি অসম্ভব নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন প্রতিটি নাটকে। চরিত্রের প্রতিটি সংলাপ, প্রতিটি মুভমেন্ট নিয়ে ঘণ্টার পড় ঘণ্টা চর্চা করেছেন, পরিশ্রম করেছেন। "রাজা লিয়ার" নাটকের মহলার শেষে সুমন যখন অভিনেতা কলাকুশলীদের তাদের ভুল-ত্রুটি বুঝিয়ে দিতেন, অন্যান্যদের সঙ্গে বসে তিনিও সেই নির্দেশ শুনতেন। এতে বিব্রত হতেন নির্দেশক সুমন নিজেই। সুমন প্রস্তাব দিয়েছিলেন, ওনাকে ওঁর সাজ ঘরে গিয়ে আলাদা করে বলবেন যা বলার। সৌমিত্র রাজী হননি। বলেছিলেন, "আমাকে আলাদা করে কেন বলবে ? যা বলার সবার সামনে বলবে।" যখন স্বপ্ন-সন্ধানীর সঙ্গে "টিকটিকি" নাটকের কাজ করছেন, তখন দাবি

করেছিলেন, দলের প্রতিটি সদস্য – সে অভিনেতাই হন বা কলা-কুশলী, প্রত্যেককে প্রতিটি রিহার্সালে হাজির থাকতে হবে। কৌশিক সেন বলেছেন, "এতে উপকৃত হয়েছে দলের সদস্যরাই। ওঁর মত শিল্পীর কাছ থেকে সরাসরি থিয়েটারের পাঠ নেবার সুযোগ কজনের ঘটে ?"

সৌমিত্রর নাটক বাংলা থিয়েটারে এক নিজস্ব ঘরানা তৈরি করে নিয়েছে। উনি যে সমস্ত নাটক লিখেছেন এবং প্রযোজনা / পরিচালনা করেছেন, সে নাটকে অহেতুক রাজনৈতিক স্লোগান নেই, তথাকথিত কোনরকম কোরিওগ্রাফিক গিমিক নেই, দর্শক বিভ্রান্ত করা আঁতলামো নেই। আবার "বীর রসে ঝঙ্কৃত" অথবা "তীব্র ভাবাশ্রুসিক্ত" প্রচলিত বাজারি নাটকও নয়। তাঁর নাটকে তিনি চেয়েছেন "সমসময়ের অধুনাতম জীবন" যুদ্ধের গল্প, যাকে ধরে থাকে এক টান টান প্লট, এবং যা মঞ্চে প্রকাশ করে এক গভীর জীবন বোধ। দুঃখের বিষয়, সমসাময়িক বাংলা নাটকের টেক্সটে তাঁর পছন্দসই কিছু পাচ্ছিলেন না। তাঁর নিজের কথায়,

"... পছন্দমত সাম্প্রতিক কালের দর্পণ স্বরূপ বাংলা নাটক পাওয়া বেশ শক্ত ছিল।"

দুঃখ করে বলেছেন,

"আমার সমসাময়িক-কালের যারা শক্তিমান নাট্যকার তাঁদের কাছ থেকে অভিনয় সমর্থ ও মঞ্চ প্রয়োগের উপযুক্ত নাটক বহু যাচনা সত্ত্বেও বেশির ভাগ সময়েই আমি পাইনি। আবার এমন অনেক নাট্যকারের নাটক হাতে এসেছে যা আমার পছন্দ হয়নি।"

তাই তিনি নিজেই কলম তুলে নিয়েছিলেন। তবে ওঁর প্রায় সব নাটকই বিদেশী নাটকের বঙ্গীকরণ। সে ব্যাপারে তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি তিনি লিখেছেন তাঁর নাটক সমগ্রের মুখবন্ধে –

"... এক সময় বিদেশী নাটকের মধ্যে সন্ধানী চোখ ঘুরতে লাগল। সেখানে যা দেখতে পাচ্ছিলাম তা নাটকের নির্মান কৌশল – আখ্যান বিন্যাসের নিয়ম কানুন – প্লট তৈরি করার মুনশিয়ানা। সেই সঙ্গে মানব চরিত্রের ও মানব সমাজের গভীর উদ্ভাস। হতে পারে তাতে আমাদের দেশের সমাজ, কিম্বা এই সমাজের জীবন লীলার প্রত্যক্ষ চিত্র বিম্বিত হয়ে নেই। কিন্তু মানুষ যেখানেই সত্য হয়ে দেখা দেয়, তা যদি দূর দেশের প্রাণ চিত্রও হয়, তবু সেখানেই তাঁর একটা আন্তর্জাতিক চেহারা – তাঁর চিরকালীন স্বভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেখানে মানব জীবনের আত্যন্তিক রূপকে খুঁজে নিতে পারা যায়।"

বিদেশী নাটক অবলম্বনে বাংলা নাট্য প্রযোজনা কলকাতায় নতুন কিছু নয়। অনেক সময় বিজ্ঞাপনে মূল নাট্যকারের নামটাও ঘোষিত হয়না। সৌমিত্র যদিও তাঁর নাটক সমগ্রের প্রত্যেকটি নাটকের মূল নাটক এবং নাট্যকারের নাম দিয়েছেন, কিন্তু অনেক প্রযোজনার বিজ্ঞাপনে সেই ঋণ তিনি স্বীকার করেননি। তাঁর বিখ্যাত নাটক "নাম জীবন" (যা ত্রিনিদাদের নাট্যকার এড়ল জন এর "মুন ওন এ রেনবো শল" অবলম্বনে রচিত) নাটক প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এই ব্যাপারে তাঁর মত প্রকাশ করেছেন –

"... আমি আদ্যোপান্ত পেশাদার। পেশাদার রঙ্গালয়ে দর্শক শুধু বিদেশী নাম দেখে আতঙ্কিত হয়ে নাটক বর্জন করুন এটা আমি চাইনি। পাবলিক থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে 'বিদেশী নাটকের ছায়া অবলম্বনে' দেখলে প্রথম চোটেই দর্শক থিয়েটারে আসতে চাইতেন না, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। অতএব নাটক লেখক হিসেবে আমারই নাম দেওয়া স্থির হয়। আজকাল তো অনুবাদক অবলম্বনকারী সকলেই বিজ্ঞাপনে নাটক – অমুককৃত বলে নিজেদের নামই বিজ্ঞাপিত করছেন। সেই প্রথার সাহায্য নিয়ে দর্শককে যদি রঙ্গালয়ে আসার ব্যাপারে নিশ্চিতই চেয়ে থাকি, তাহলে বোধহয় ঘোর অন্যায় কিছু হয়নি।"

কাজটা উনি ঠিক করেছেন না বেঠিক করেছেন সে বিতর্কে না গিয়ে এটুকু বলতে পারি যে এই ধরনের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি করার সৎ সাহস আজকের থিয়েটার মহলে খুব কম মানুষেরই আছে।

মৌলিক নাটক তেমন লেখেননি বলে অনেকসময় তিনি সমালোচিত হয়েছেন। একটি সংস্থা তাঁকে নাটক রচনার জন্য সম্মাননা জানাবার কথা ঘোষণা করেও প্রত্যাহার করেছেন, কারণ তিনি মৌলিক নাট্যকার নন। কিন্তু সেই কারণে তিনি কখনো কোনরকম ক্ষোভ প্রকাশ করেননি। বরং অকপটে বলেছেন,

"আমার বন্ধুবান্ধব হিতৈষী অনেক সময় আমাকে মৌলিক নাটক এত কম লিখেছি বলে অনুযোগ করেন। এর জবাবে বলতে পারি – আমি নাট্যলেখনের সংলাপ, চরিত্র কল্পনা, পরিবেশ রচনা প্রভৃতি সব কাজ মোটামুটি করে উঠতে পারলেও চিত্তাকর্ষক সঘন একটি আখ্যান, অর্থাৎ প্লট তৈরি করা আমার ক্ষমতায় কুলোয়নি। ... তাই বিদেশী ভাল নাটক থেকে প্লট – তাঁর গতির বিচিত্রগম্যতা – অভাবিত অপূর্বদৃষ্ট ঘটনার ঘনঘটা – আমাকে ধার করতে হয়েছে। এবং ধার করার পরে স্বদেশিকরনের দাবিতে সেই প্লটেরও অধিকাংশ সময়েই নবনির্মাণ করে এক নতুন আখ্যান আমাকে তৈরি করতে হয়েছে। আশাকরি এর জন্য সহৃদয় দর্শক পাঠকের কাছে চোর দায়ে ধরা পড়ার দায় থেকে অব্যাহতি পাব।"

সৌমিত্র নিজে কবি। এক্ষণ পত্রিকার সম্পাদক। অনেক গদ্যও লিখেছেন। সুতরাং ইচ্ছে করলেই তিনি যে উচ্চমানের মৌলিক নাটক লিখতে পারতেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমার ব্যক্তিগত ধারনা, যে বিদেশী নাটকগুলি পড়ার পরে উনি সেগুলিকে এতটাই ভালবেসে ফেলেছিলেন, যে তার এডাপ্টেশান এবং পরবর্তী কালে মঞ্চস্থ না করে থাকতে পারেননি। তবে এডাপ্টেশান করলেও, প্রতিটি নাটকেই তিনি রেখে গেছেন তার নিজস্ব জীবন বোধের পরিচয়। তাঁর নিজের ভাষায়,

"... আমি আমার জীবনে যেমন করে মানুষজন সমাজ সংসার দেখেছি বুঝেছি, সেই অভিজ্ঞতাটা আমার লেখার মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হতে থাকে। সেটা আমারই জীবনদৃষ্টি দিয়ে তৈরি হয়।"

শ্রী শমিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় জানতে পারি, বাংলায় বার্টল্ট ব্রেখটের এডাপ্টেশান হয়ত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ই প্রথম করেছেন। ব্রেখটের "এক্সেপশেন এন্ড দ্য রুল" নাটকটি শিশির ভাদুরি সৌমিত্রকে দেন এবং তার বাংলা অনুবাদ করতে বলেন। সৌমিত্র সেই নাটকটিকে সম্পূর্ণ ভাবে ভারতের তথা বাংলার মাটিতে এনে ফেলেছেন "বিধি ও ব্যতিক্রম" নামে।

আমার দেখা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনীত প্রথম নাটক "টিকটিকি"। নাটকটি দেখেছিলাম ফিলাডেলফিয়া বঙ্গসম্মেলনে। স্বপ্ন সন্ধানী দলের প্রযোজনায় নাটকটিতে অভিনয় করেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং কৌশিক সেন। এন্থনি শেফারের মূল নাটক "স্লিউথ" (Sleuth) অবলম্বনে এই নাটকটির বঙ্গিকরণ করতে সৌমিত্রকে অনুরোধ করেছিলেন উৎপল দত্ত। কথা ছিল অভিনেতৃ সঙ্ঘের প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হবে নাটকটি। দুই চরিত্রের এই নাটকে অভিনয় করবেন উৎপল দত্ত এবং সৌমিত্র। নির্দেশনায় থাকবেন উৎপল দত্ত নিজে। কিন্তু নানান কারণে সে প্রযোজনা হয়ে ওঠেনি। এরপর "টিকটিকি" নিয়ে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করার কথা হয়েছিল। অভিনয়ে থাকবেন সত্যসিন্ধুর ভূমিকায় উত্তমকুমার ও বিমলের ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু সে পরিকল্পনাও বানচাল হয়ে যায়। এর প্রায় দুই দশক বাদে স্বপ্ন সন্ধানী এই নাটক প্রযোজনার দায়িত্ব নেন। নির্দেশনায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। নাটকটি ১৯৯৫ সালের শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা হিসেবে এশিয়ান পেন্টস শিরোমণি পুরস্কারে ভূষিত হয়।

"টিকটিকি" ছাড়াও আমি ওর আরও খান তিনেক নাটক দেখেছি। "নীলকণ্ঠ" এবং "টিকটিকি" দেখেছি এদেশে (আমেরিকায়), কলকাতায় বসে দেখেছি "ফেরা" এবং "বিদেহী"। নিউ জার্সির "নীলকণ্ঠ" প্রযোজনায় বেশ কিছু স্থানীয় শিল্পীও অভিনয় করেন। "ফেরা" বা "বিদেহী" যে সময়ে আমি দেখেছি, সে সময়ে বয়সজনিত কারনে সৌমিত্র

বড় কোন চরিত্রে অভিনয় করেননি। আর এখানেই ওঁর থিয়েটার মানসিকতার পরিচয়। একজন প্রকৃত থিয়েটার অভিনেতার কাছে চরিত্র ছোট বড় হয়না। এই সত্যটা উনি ওঁর কাজের মাধ্যমে বার বার বুঝিয়ে দিয়েছেন। "বিদেহী" (ইবসেন-এর ঘোস্ট অবলম্বনে) নাটকের নির্দেশক কৌশিক সেন বলছিলেন, ওই ছোট্ট চরিত্রের জন্যেও কত পরিশ্রম করেছেন উনি। নিজেকে কিভাবে একটি চরিত্রের জন্য, সে যত ছোটই হোক না কেন, তৈরি করতে হয়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে তা শিক্ষণীয়। "ফেরা" নাটকটিতে আগে উনি যে চরিত্র অভিনয় করতেন, মুখোমুখি নাট্যদলের সাম্প্রতিক প্রযোজনায় সেই চরিত্রে অভিনয় করেন দেবশঙ্কর হালদার। বয়েসে অনেক ছোট দেবশঙ্করের উপর উনি ওঁর মতামত তো চাপিয়ে দেনই নি, বরং বলেছিলেন, "তুমি আমার চরিত্রগুলো এত ভাল কর, মনে হয় যেন আরেক ধরণের মানে পেল সেগুলো। আমার খুব ইচ্ছে করে, আমার অন্যান্য চরিত্রগুলো তুমি কেমন করো, দেখতে।" খুব বড় মাপের শিল্পী না হলে এমন কথা বলা সহজ নয়।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার বার চার পাঁচ দেখা সাক্ষাৎ হলেও, ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠেনি কখনও। আসলে ওঁর বিশাল ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়িয়ে, আমি নিজে ভাষা হারিয়ে ফেলতাম। ফলে সামান্য কিছু সৌজন্য মূলক আলাপচারিতার পর কথা আর এগুত না। একবার ওঁর নাট্যদল "মুখোমুখি" আয়োজিত নাট্যোৎসবে আমার নাটক মঞ্চস্থও করেছি। তখনও ওই সামান্য সৌজন্য বিনময়ের বেশি কিছু ঘটেনি। শেষ দেখা "বিদেহী" নাটকের শেষে একাডেমীর সাজঘরে। জীবনে স্বপ্ন ছিল, যদি উনি আমার লেখা কোন নাটকে অভিনয় করেন। কিন্তু আফসোসের কথা, সে স্বপ্ন পূরণ হতে হতেও শেষ পর্যন্ত হয়নি। তবে আজ মনে হয়, কিছু স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে যাওয়াই হয়ত ভাল। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মত অভিনেতা হয়ত আরও আসবেন, কিন্তু তাঁর মত থিয়েটার শিল্পের প্রতি সম্পূর্ণ কমিটেড মানুষ আর আসবেন কিনা সন্দেহ।

শ্যামলী আচার্য

শিশিরের ছায়া

"ইচ্ছে হলেও কোনওদিন ওঁকে বলতে পারিনি যে, 'আপনি পৃথিবীর একটি মহত্তম সৃষ্টি থেকে বঞ্চিত – কারণ আপনি শিশিরকুমারের অভিনয় দেখেননি।' শুধু ওঁর মুখ থেকে শুনেছি গিরিশবাবুকে কেমন দেখেছেন উনি, কেমন দেখেছেন রবীন্দ্রনাথকে, অর্ধেন্দুশেখরকে, অবনীন্দ্রনাথকে। বোধহয় দা ভিঞ্চির কথাটাই সত্যি –

The sun has never seen its shadow!"

লিখছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে অনর্গল লিখে গেছেন তাঁর অভিনয়-গুরুর কথা। যাঁকে অনুসরণ করেছেন, কিন্তু অনুকরণ করেননি কখনও। সেই নক্ষত্রের নাম শিশিরকুমার ভাদুড়ি। সৌমিত্রর অভিনয়জীবনে যাঁর গুরুত্ব আর অনুপ্রেরণার কথা বারে বারে স্বীকার করেছেন তিনি নিজেই।

প্রথম আলাপ ১৯৫৬ সালের ২৪ জানুয়ারি। শ্রীরঙ্গমে সেদিন 'প্রফুল্ল' নাটকের শেষ অভিনয়। শেষ দৃশ্যে শিশিরকুমার হাতদুটো আকাশের দিকে তুলে শেষবারের মতো বললেন, 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল'। শ্রীরঙ্গমে বরাবরের মতো পর্দা পড়ে গেল। আক্ষরিক অর্থেই যবনিকা পতন। কোর্টের পেয়াদা সাজঘরের বাইরে দাঁড়ানো। শিশির ভাদুড়িকে স্টেজ থেকে সরিয়ে তারা মঞ্চের দখল নেবে এবার। ঠিক সেই এক আশ্চর্য সন্ধিক্ষণে যেন ব্যাটন বদল হয়। মুখোমুখি দেখা হয় বাংলা নাটকের কিংবদন্তী শিশিরকুমার ভাদুড়ির সঙ্গে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের। ফিফথ ইয়ার বাংলা ক্লাসের ছাত্র, 'কৃষ্ণনাগরিক' সৌমিত্রর সঙ্গে তাঁর এই প্রথম সাক্ষাৎকার। এই দেখা ক্রমশ আরও বহু মুহূর্তের জন্ম দেয়। যে মুহূর্তের মধ্যে আজ কিছুক্ষণ হেঁটে বেড়াব আমরাও। তার কারণ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। একজন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বেড়ে ওঠা, গড়ে ওঠা আর পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার পিছনে একজন শিশিরকুমারের দীর্ঘ ছায়া থাকে।

শিশির ভাদুড়ির সিঁথির বাড়িতে যেতেন সৌমিত্র। প্রথম থেকেই উপলব্ধি করেছেন, শিশিরকুমার একজন আদ্যোপান্ত বাঙালি হয়েও কী ভীষণ আন্তর্জাতিক। যেন পৃথিবীর নাগরিক। গিয়ে হয়ত দেখলেন, অক্সফোর্ডের কম্প্যানিয়ন হাতে বসে আছেন। হাতে এনামেলের চটা ওঠা চায়ের কাপ। প্রচুর আলোচনা চলছে। সে আলোচনায় উঠে আসছে ইসকাইলাস থেকে বার্নার্ড শ, চর্যাপদ থেকে রবীন্দ্রনাথ। যখন কলকাতায় কেউ ব্রেশটের নামই শোনেনি, সেইসময় শিশিরকুমার ব্রেশটের কথা বলছেন তাঁর অনুগত জনটিকে। সত্তরের সঙ্গে চব্বিশের বন্ধুত্ব। এই বিরাট ফারাকের মধ্যে বয়স শুধু একটি সংখ্যা মাত্র; দুই অসমবয়সী দুজনের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছেন নির্ভর বিনিময়। ফিরে আসার সময় যিনি অক্লেশে বলতে পারতেন, 'এসো আবার। তোমার খানিকটা সময় নষ্ট হয় বোধহয় – কিন্তু কথা বলার লোক পাই আমি। সপ্তাহে একবার অন্তত এসো। আই ফীল ভেরি লোনলি।'

সৌমিত্রর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর মাত্র তিন বছর বেঁচেছিলেন শিশিরবাবু। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই সৌমিত্রর অভিনয় এবং পড়াশোনার জগতে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়ে যান। আধুনিক সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করলে বলেন, 'দ্যাখো ওসব আমার পড়া নেই। তিরিশের ওপারে আমাদের যুগ শেষ হয়ে গেছে – পড়াশোনার সীমাও সেই অবধি।' অথচ সমর সেন, জীবনানন্দ পড়েছেন। অনুবাদ করাচ্ছেন ব্রেশটের 'দি একসেপশন অ্যাণ্ড দ্য রুল'। খুব পুরনো বই পড়েন। বলেন, 'পুরনো বিদ্যে সিরিয়াসলি রিভাইজ করা দরকার'। এনসাইক্লোপিডিয়ার সিরিজ, অক্সফোর্ডের লিটারারি কম্প্যানিয়ন, কিছু অভিধান, সাহিত্যের ইতিহাস সংক্রান্ত অসংখ্য বইপত্র, রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে

স্বাক্ষরিত বই। তখনও হাজার দেড়েক বই তাঁর সংগ্রহে। যা আছে, তার তিনগুণ চুরি হয়ে গেছে। এই অস্বাভাবিক জ্ঞানপিপাসা, বইয়ের প্রতি এই দুর্দমনীয় নেশা বোধহয় অজান্তেই সঞ্চারিত হয়েছিল তাঁর শেষবয়সের নিকটজন সৌমিত্রর মধ্যে। যা পড়াশোনা করেছেন, তাই পড়তেই একটা গোটা জীবন যথেষ্ট নয়। সৌমিত্র নিজেই উল্লেখ করেছেন, 'অনেক নাম করা অধ্যাপক, ডাকসাইটে পণ্ডিতের কাছে গিয়েছি। কিন্তু এমন লিটারেরি কনসায়েন্স আর কারও দেখিনি।' মাঝেমধ্যে শিশির বলেছেন, 'সৌমিত্র, এক এক সময় দুঃখ হয় জীবনে কিছু হল না। যে কথাটা বলতে চেয়েছিলাম সেটা কেউ বোঝেনি।' নিবে আসা চুরুটে তখন আরও একবার দেশলাই জ্বালাচ্ছেন তিনি। সৌমিত্র বার বার স্বীকার করেছেন, এই সান্নিধ্য তাঁকে পরিণত করেছে, জীবনবোধে উদ্দীপিত করেছে, জ্ঞানচর্চায় শাণিত করেছে আর বলাই বাহুল্য তাঁর অভিনেতা সত্তার আকাশপ্রমাণ উত্তরণ ঘটিয়েছিল। গল্প করতে করতে উঠে আসে সেই যুগের থিয়েটারের অভিনেতাদের কথা। শিশিরকুমার অসম্ভব শ্রদ্ধা করতেন গিরিশচন্দ্রকে। সৌমিত্র 'তখনকার অভিনয়' নিয়ে কথা বলতে চাওয়ায় ক্ষুব্ধ হন। বলেছিলেন, 'তখনকার অভিনয়' কথাটার কোনও মানে হয় না। অভিনয় সব সময়ই অভিনয়। অভিনয় বা থিয়েটারের ব্যাপারে আলোচনার সময় তিনি অসম্ভব নির্মম। কোনও বিবেচনাতেই তিনি আপস করেন না। নিজে কোনও বড় অভিনেতার কাছ থেকে প্রত্যক্ষ শিক্ষা পাননি। তবে কয়েকজনের অভিনয় দেখেই অভিনয় করতে শিখেছেন একথা স্বীকার করতেন। নিয়মিত থিয়েটার দেখতেন, ভালো অভিনেতাদের অভিনয় দেখা তাঁকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। নিজেই বলেছেন, 'গিরিশবাবুকে যে আমি গুরু বলি তার কারণ এই নয় যে তিনি হাতে ধরে একটি লাইনও আমাকে শিখিয়েছেন। কারণ এই যে, তাঁর অভিনয় দেখে দেখেই আমি শিখেছি অভিনয় কাকে বলে।' নির্ভরযোগ্য ভালো সমালোচকের সামনে অভিনয় করে গেছেন বহুকাল। সৌমিত্র নিজেও শিখেছেন এই সারসত্য। ভালো সমালোচনা ভালো অভিনয়ের পক্ষে অপরিহার্য। আর শিখেছেন প্রযোজনা। কারণ, শিশিরকুমারের আগে নাট্যকলার সব বিভাগে নজর দিয়ে অভিনয় হত না। শিশির ভাদুড়ি বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রথম প্রয়োগকর্তা। মনে রাখতে হবে, নাটকের মঞ্চায়নে 'প্রয়োগ' শব্দটা আধুনিক অর্থে সচেতন ভাবে রবীন্দ্রনাথই প্রথম ব্যবহার করেছিলেন শিশিরকুমারের কাজ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে। নাটকের যূথ অভিনয়, দৃশ্যপট, আলোকের ব্যবহার, ধ্বনি, সঙ্গীত সব নিয়ে সমগ্র থিয়েটারের ধারণা শিশিরকুমারের প্রয়োগের মধ্য দিয়েই বাংলা রঙ্গালয়ে প্রথম সার্থকভাবে দেখা দিয়েছিল। এই মানুষটিই সৌমিত্রকে বলেছেন, শিল্পবিদ্যা কাউকে দেওয়া যায় না। যে শিল্পী হবে, শিল্প তাকে অর্জন করতে হবে। শিল্পের জাজিমে কেউ তাকে হাতে ধরিয়ে বসিয়ে দেবে না।

দিনের পর দিন থিয়েটার দেখেছেন সৌমিত্র। সামনে বসে দেখেছেন শিশিরকুমারকে। অনুভব করেছেন তাঁর ব্যক্তিত্ব। কখনও মঞ্চে, কখনও তাঁর নিজের ঘরের চৌহদ্দিতে। একমাত্র শিশিরকুমারের থিয়েটার থেকে ফিরেই তাঁর মনে হত একটা স্পিরিচুয়াল এক্সপিরিয়েন্স হল। অভিনয় কেমন করে তার সীমাকে অতিক্রম করে, কেমন করে সাবলাইম হয়ে যায়, শিশিরকুমারের অভিনয় দেখে শিখেছেন। আবেগগুলো নিয়ে যেমন খুশি মন্থন করেছেন বলেই বোধহয় দেখেছেন সমস্ত আবেগ জমাট বেঁধে গেছে। যৌবনের এই শিক্ষা ধারণ করেছেন শেষদিন পর্যন্ত।

সৌমিত্রর আত্মকথন থেকেই ধার করে বলি শিশিরকুমারের সঙ্গে তাঁর একই মঞ্চে সহশিল্পী হিসেবে অভিনয়ের দুর্লভ সুযোগের কাহিনি ঃ

"যেদিন প্রথম ওঁর কাছে যাই সেদিন থেকে কেবলই বলি আমাকে অভিনয় শেখাতে হবে। উনি বলেছেন, 'স্টেজ নেই, কোথায় শেখাব। তবে ইফ আই ফর্ম আ কোম্পানি, আই মাস্ট টেক ইউ'। সহস্র আলোচনা করেন অভিনয়ের ব্যাপারে। কিন্তু হাতেকলমে অভিনয় করার সাধ তো তাতে মেটে না। ইতিমধ্যে কার কাছে জানলাম 'প্রফুল্ল' হচ্ছে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে। ছুটতে ছুটতে গেলাম সিঁথি। বাসস্টপ থেকে বাড়ি অবধি যেতে যেতে ভাবছি, কি করে বলব – হয়ত বলতেই পারব না মুখ ফুটে। বাড়ি গেলাম। বিকেল হয়ে আসছে। বি টি রোড তখনও নির্জন। খবর দিতে উনি নেমে এলেন। কাঁধের ধারে বোতাম দেওয়া সাদা পাঞ্জাবি আর সিল্কের লুঙ্গি পরনে। কি বলব না বলব তাই ছটফট

করছে মনের ভেতরে। মরিয়া হয়ে বোকার মতো বলে ফেললাম, 'আচ্ছা প্রফুল্ল হচ্ছে – তাই না ?' তারপর যে কথাগুলো কানে ঢুকল তা অতি আকাঙ্ক্ষিত হলেও অনভিপ্রত্যাশিত – বিশ্বাস হতে চাইছিল না। – 'কেন তুমি পার্ট করবে ?' একেবারে ছেলেমানুষের মতো বলে ফেললাম – 'হ্যাঁ আমি পার্ট করব।' যেন আবদার। বললেন, 'হ্যাঁ আমিও তোমার কথা ভেবেছি। তোমাকে দিয়ে সুরেশটা বেশ হয়। করবে ?' কি বলব ? কাটা সৈনিক নয়, ক্রাউড নয়, শিশিরকুমারের যোগেশের পাশে আমি সুরেশ। বুকের ভেতরটা খুশিতে উত্তেজনায় আশঙ্কায় ঢিপঢিপ করতে লাগল। কিন্তু প্রাণপণে মুখের ভাব গোপন করার চেষ্টা করছি যেন কিছুই হয়নি। বললেন – 'এক কপি প্রফুল্ল কিনে নেবে। খুব ভালো করে পড়বে অ্যান্ড দেন থিংক।' রিহার্সালের জায়গা বলে দিলেন। দেশবন্ধু পার্কের কাছে 'সমাজ' ক্লাবের একটি ছোট ঘর। বললেন, 'রিহার্সালে এসো তাহলেই হবে'। ... আমি সেদিন যে শিশির ভাদুড়িকে দেখলাম তিনি একটা ছোট্ট এঁদো ঘরে কতকগুলি সাধারণ অভিনেতাকে বাচনভঙ্গি শেখাচ্ছেন। আর চরিত্রের ধারণা বলে দিচ্ছেন।"

সাহিত্য বা ভাস্কর্য বা ছবি বা গানের স্বরলিপির মতো কোনও কিছু তো কালের মহাফেজখানায় জমা রেখে যায় না অভিনেতা। বিশেষত মঞ্চের অভিনেতা। জন্মলগ্নেই বিনাশের ঘন্টা বেজে ওঠে তাঁর সৃষ্টির। লিখিত আলোচনা সমালোচনার স্রোতপথে অনেক সময় অভিনেতার সৃষ্টি উত্তরকালের বন্দরে এসে লাগে। শিশিরবাবুর সম্পর্কে তেমন আলোচনা কমই হয়েছে। কিন্তু তাঁর অনুগত জন সৌমিত্র এই পরিণতি স্বচক্ষে দেখেছিলেন বলেই হয়ত প্রথম থেকেই সতর্ক ছিলেন। ইংরেজ ফরাসী জার্মান ও রুশ এই কয় জাতির শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন সৌমিত্র, এবং শেষে একবাক্যে স্বীকার করেছেন, 'বিখ্যাত রুশ অভিনেতা কাচালভ ছাড়া আর কোনও অভিনেতাকেই আমি শিশিরকুমারের চেয়ে বড় অভিনেতা মনে করি না।'

আমরা শিশিরকুমারকে দেখিনি, দেখেছি সৌমিত্রকে। একবার যদি ফিরে তাকাই সৌমিত্র কেমন করে শিখছেন শিশিরকুমারের কাছ থেকে, তা হলেই স্পষ্ট হয়ে যায় সৌমিত্রর অস্বাভাবিকরকম স্বাভাবিক অভিনয়। যাকে অভিনয় বলে মনেই হয় না।

'শিশিরকুমারের সব থেকে বড় শেখানো হল ভাবতে শেখানো। পার্টটা সম্বন্ধে ভাবতে তিনি অভিনেতাকে ইন্সপায়ার করেন। নিজে পার্টটা সম্বন্ধে তার থেকেও বেশি ভাবেন। চরিত্রটা কি এ নিয়ে গোড়াতেই একটা ইন্টেলেকচুয়াল ডিসকোর্স কিছু দেন না। মোটামুটি রিহার্সাল আরম্ভ হলে তারই ফাঁকে ফাঁকে চরিত্রটা বুঝিয়ে দেন দরকার মতো'। শিশিরকুমার সমস্ত নাটকটা যেন গোয়েন্দাগিরি করে পড়তেন। কোথায় কী লুকনো, সুপ্ত, প্রচ্ছন্ন আছে, সমস্ত হদিশ টেনে বের করেন। পড়ার সময় সেই কাটাছেঁড়া থেকে উঠে আসে নতুন নতুন সাজেশান। নাটকের নতুন রূপ তৈরি হয়। চরিত্রের ধারণা বদলে যায়। কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্ব আরোপ করেন না। অন্যের ভেতরে যে সম্ভাবনা আছে, তা'ও টেনে বের করেন। ডায়ালগ শেখান আশ্চর্য সাবলীলভাবে। বলেন, 'স্বাভাবিক যা তাকেই বের করে নিয়ে এসো – উইথ নেসেসারি ইনটেনসিফিকেশান অফ ইমোশান হোয়্যার প্রপার, হোয়্যার সিগনিফিক্যান্ট।'

কোথাও মেলাতে পারছেন সৌমিত্রর অভিনয়শৈলীকে ?

মঞ্চে অভিনয়ের সময় গলা উঁচু স্কেলে বেঁধে নিতে বলতেন শিশিরকুমার। কিন্তু চিৎকার নয়। বরং স্পষ্ট উচ্চারণ, শ্রুতিগ্রাহ্য করে তোলা সকলের কাছে। অর্থ বুঝে সংলাপ বলা, মডিউলেশন হবে যেমন কণ্ঠ তার ওপর দাঁড়ানো। সৌমিত্র তাঁর এই অভিব্যক্তি আর উচ্চারণের শিক্ষা পেয়েছেন শিশির ভাদুড়ির কাছে। মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন সে কথা। আমরা যখন সত্যজিতের সৌমিত্রকে খুঁজে বেড়াই, তখন মনেই রাখি না সৌমিত্র তাঁর প্রথম যৌবনের উন্মাদনা নিয়ে আপাদমস্তক কালটিভেট করেছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়িকে। ছাঁচ-না-পড়া কম বয়সে সজীব মনের ওপর অত উঁচু দরের অভিনয় প্রভাব সৃষ্টি করেছিল বলেই তাঁর আশৈশবের নেশাকে তিনি পেশা করে নেবার ঝুঁকি নিয়েছিলেন।

সৌমিত্র লিখেছেন, শিশির ভাদুড়ির ছিল একস্ট্রা-হিউম্যান এনার্জি। তাঁর নিজেরও কী তা'ই নয় ? শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির এমন কোনও শাখা নেই, যেখানে তিনি স্বচ্ছন্দে আঁচড় কাটেননি। আবৃত্তি থেকে ছবি আঁকা, কাব্যচর্চা থেকে 'এক্ষণ' সম্পাদনা, তাঁর গণ্ডিতে যখন যা এসেছে, তাকে আকণ্ঠ পান করেছেন সৌমিত্র। ১৯৫৮ সালে 'অপুর সংসার'-এর চিত্রনাট্যের শেষে সত্যজিৎ এক নবাগত অভিনেতাকে লিখে দিলেনঃ Where despair has given way to hope

And bitterness to love...

And the river flows on.

অপু তার কাজলকে পিঠে চড়িয়ে এগিয়ে চলেছে সোনালি ভবিষ্যতের দিকে। নতুন স্বপ্ন আঁকবে সে। সেই দৃশ্যই আগামীদিনের এক অভিনেতার বর্ণময় জীবনের অনবদ্য শট।

সুবীর রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

সৌমিত্র আর আমি

সুপ্রিয় পাঠক, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কত বড়ো একজন শিল্পী, কবি, নাট্যকার বা নির্দেশক ছিলেন, তা বর্ণনা করা নিতান্তই মূর্খামি, কারণ আমরা প্রত্যেকেই আমাদের মতো করে ওনাকে শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়েছি আপন আপন হিসেবের মাপে। সবাই জানি উনি versatile Ges legend, ওঁর প্রতিভার বিশ্লেষণ করার ধৃষ্টতা আমি করবো না, আমার এ লেখার সূত্র শুধুই আমার মুগ্ধতা। ওনার সাথে আমার একান্ত নিজের মুহূর্ত বলতে কেবল একটি autograph নেওয়ার সান্নিধ্য, তা ছাড়া রূপালী পর্দা বা নাট্যমঞ্চ জুড়ে ওনার মন কেড়ে নেওয়া অভিনয় আর তারই সাথে গড়ে উঠেছে আমার ছোটবেলা, বড়ো বেলার ভালো লাগার এক নিবীড় সম্পর্ক। মানুষ সৌমিত্র কে চিনি না আমি, অথচ interview, পত্র, পত্রিকা থেকেই যেন বড় নিজের মানুষ হয়ে গেছেন তিনি। সম্পর্ক বুঝি এক অনুভূতি, ওনার অভিনয় দেখলে আনন্দ হয়, কখনো গল্পের চরিত্রে ওঁনার চোখে জল দেখলে মনটা দুমড়ে মুচড়ে কেঁদে ওঠে, আবার রোমাঞ্চকর রোল-এ মনে হয় বসন্ত আজ এসে গেল। ছোটবেলা থেকে আমার বেড়ে ওঠা এক সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে তাই বোধ আর বুদ্ধির সাথে অনেক কবি সাহিত্যিকের কাজের সাথে তৈরি হয়েছে পরিচিতি, জেনেছি চলচ্চিত্র পরিচালকদের কাজ তবু কোথায় যেন আত্মার আত্মীয় হয়ে গেলেন সৌমিত্র।

১৯৭৮, এগারো class এর তারুণ্যে তখন অনেক রকম নিজস্ব ভাবনা চিন্তা বেড়ে উঠছে, তেমন করে বাংলা সিনেমা মন কেড়ে নেয় না, উত্তম সুচিত্রার রোমাঞ্চকর জুটি নিয়ে একটু ভ্রূকুটি, এমনটাই ছিলাম। "মিত্রা" সিনেমা হল-এ ফের এল "অপুর সংসার"। বাড়ীতে দাদারা বলেন এই চলচ্চিত্র টা যেন miss না হয়। যেমনি ভাবা অমনি কাজ, এমন তৎপরতা পড়াশুনোতে খুব বেশী দেখাতাম তা নয় কিন্তু সে যাক, ticket এর ব্যবস্থা করে ফেললাম। দল বেঁধে যাবো, যেমন যাই। অনেক বন্ধু মিলে হইহই করে যাওয়ার আনন্দ যেমন থাকে, তেমনটাই ছিল। চলচ্চিত্র দেখব, তারপর চায়ের কাপ-এ তুফান তুলবো সমালোচনার, তুনলনামূলক বিচারে বৈদেশিক চলচ্চিত্র কত ভালো ইত্যাদি আলোচনার পর ফের অপেক্ষা করব আর একটা অন্য হুজুগের, এমনি ভেবে নিযেছিলাম সেই সন্ধ্যাটাকে ও । অথচ সারা ছবি ধরে এক অচেনা চুপ থাকা ছেয়ে ছিল আমায় আর সেই চুপ থাকা নিয়েই চলে এলাম চায়ের আড্ডায়। সেই প্রথম আলাপ Film Maker Satyajit Ray এর সাথে, আলাপ সৌমিত্রর সাথে। নাটক বা সিনেমা দেখার পর একটা তাত্ত্বিক আলোচনা আমাদের বরাবরই হয়, কিন্তু সেই সন্ধ্যা এক ব্যতিক্রম হয়েই থেকে গেল। চুপ থাকার মধ্যেই শেষ হয়ে গেল প্রথম ভাঁরের চা, শেষ হল আরো অনেক ভাঁরের চা। রেশ যেন আর কাটছে না, মন জুড়ে এক স্বপ্নের আবেশ, তৈরী হল এক ভালো লাগা, জন্ম নিল এক ভালবাসার, অপু যেন আমার সবটুকু জুড়ে ছেয়ে রইল। আমার ঘন চুলে টেরি কাটি, প্যান্ট এর সাথে সার্ট গুঁজে অপুকে খুঁজি। অভিনেতা সৌমিত্র কে আরো পাওয়ার লোভ বাড়তে শুরু করল, বাংলা সিনেমা-র প্রতি নতুন করে ফিরে পেলাম একটা আশা। সৌমিত্রকে পাওয়ার অধীর এক প্রতীক্ষা শুরু হলো। ১৯৬৪-৬৯ এর মধ্যে হয়ে যাওয়া সিনেমা – "অভিযান", "চারুলতা" বা "অরণ্যের দিনরাত্রি" কে আবিষ্কার করলাম পর্দায়। তখনও দূরদর্শন এমন করে সমস্ত জগৎটাকে ঢেকে দেয়নি। মেগা সিরিজ-এর উৎপাত শুরু হয়নি । দল বেঁধে সিনেমা যাওয়া একটা উত্তেজনার ব্যাপার। উজ্জ্বলা, পূরবী, বসুশ্রী, এমন অনেক ছোট ছোট থিয়েটার হল বেঁচে ছিল, cineplex তাদের গ্রাস করেনি। যেমন আস্তে আস্তে তৈরী হচ্ছে এক পরিচিতি সত্যজিতের মতো দাপুটে পরিচালক এর সাথে, ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ছি নায়ক সৌমিত্র এবং তাঁর অভিনয়ের গুণে মুগ্ধ হচ্ছি প্রতিনিয়ত।

আরো অনেক ছোট বেলায় বাড়ীর বড়দের হাত ধরে গেছি সোনার কেল্লা বা জয় বাবা ফেলুনাথের মতো ছবি দেখতে, তখন গল্পের গতিতে নজর ছিল আঁটকে, তেমন করে অভিনয় বোঝবার বা দেখবার চোখ তৈরী হয়নি। কি হবে,

এই ভেবে ভেবেই নখ কেটেছি দাঁতে, ভেতরের চাপা উত্তেজনায়। তাই আবার করে দেখলাম সেই সব ছবি। দেখলাম কেমন করে ফেলুমিত্তির মগজাস্ত্র ব্যবহার করে, দেখলাম কেমন করে এক অভিনেতা সাধারণত্ত্বের মান ছাপিয়ে অসাধারণ হয়ে ওঠেন। চোখ যে অভিনয়ের জন্য কতখানি ব্যবহৃত হয় সেদিন তা বুঝলাম। গোটা দৃশ্য জুড়ে ফেলুদার কথা নেই, কেবল তার চোখ খুঁজছে তথ্য, পরিচালক আর অভিনেতার যে symbiotic relationship খানিক হলেও বুঝেছিলাম সেদিন।

এরই মধ্যে অন্য বন্ধুদেরও আমার সৌমিত্র obsession খানিক হলেও সে রোগ সংক্রমণ করেছি, ওনার অভিনয়ে তারাও অভিভূত। আমাদের তখন রীতিমত সৌমিত্র অভিযান চলছে, ওনার ছবি তা সে আগের করা মৃনাল সেনের 'আকাশ কুসুম' বা তপন সিংহের 'ক্ষুদিত পাষাণ' কিংবা অজয় করের 'সাত পাকে বাঁধা', 'পরিণীতা' কিংবা 'ঝিন্দের বন্দী' যাই হোক যেখানেই হোক দল বেঁধে আমরা হাজির। বরানগর থেকে হুগলী, কলকাতা উত্তর থেকে দক্ষিণ ছোট বড়ো নানান হল-এ গিয়েই দেখছি এই সব কালজয়ী সিনেমা ।

একই সাথে আমার পৈতৃক সূত্রে পেয়ে যাওয়া নাটক প্রেমে আমি আগেই আক্রান্ত, তাই "নামজীবন" দেখতে গিয়ে অবাক চোখে দেখলাম তাঁর একদম অন্য এক রূপ। কি অনায়েসে এক genre থেকে এক নতুন genre উনি adapt করেন, সত্যি এক বিস্ময়। যদিও নাটকের রঙ্গমঞ্চ থেকেই তাঁর আবির্ভাব তবু এতো সুন্দর করে সিনেমার অভিনয় আয়ত্ত করেও একই দক্ষতার সাথে নাট্য মঞ্চ জয় করা, সে এক বিস্ময়! অসাধারণ stagecraft, সবমিলিয়ে সে এক নতুন অভিজ্ঞতা, আজ এতো দিন পরেও চোখ বন্ধ করে নামজীবনের মঞ্চ ভেসে উঠছে তাতে সময়ের এতটুকুও ধুলো জমে নি।

ওনার ছবি আর নাটক তখন আমার চেতনা জুড়ে আলোড়ন তুলেছে। সংসার সীমান্তের অঘোর নাকি গণদেবতার দেবু পণ্ডিত, মুয়ূরবাহন, না ক্ষিদ্দা, প্রতিটি চরিত্রেই তিনি অভিনব তিনি অদ্বিতীয়।

এর মধ্যে নিজের সংসার আর জীবিকার তাগিদে দেশ ছেড়ে নতুন দেশে সংসার শুরু করেছি তবু মনটা পড়ে থাকে সেই কলকাতায়, দেশ পত্রিকা, আনন্দবাজার খুঁটিয়ে পড়ি, বাড়ীর কথা জানতে, খোঁজ রাখি সৌমিত্রর নতুন ছবি নতুন নাটকের। নিয়ম করে প্রতি বছর দেশে ফেরার সাথে যেমন ফিরে পাই নিজের চেনা পরিচিত মুখগুলোকে তেমনি ফিরে আসে সৌমিত্র। December বা January তে নাটকের মরশুম, তাই প্রাণ ভোরে দেখি ওনাকে, কখনও অবাক চোখে টিকটিকি, ওমাপাখি, ফেরা বা নীলকণ্ঠ কখনও আদরে হাঁসিতে ঘটক বিদায়। বড় আফসোস রাজা লিয়ার দেখার সৌভাগ্য থেকে চির বঞ্চিত রয়ে গেলাম।

ইদানিং দেখা ছবি ময়ূরাক্ষী বহুবার দেখেও মন ভরে না, বাবার সেই জানলা এঁকে দেওয়া কিম্বা শিশুর মত বলে ওঠা ওই ছেলের কোথায় তো বলবো ও ছাড়া আমার তো আর কিছুটি নেই, কোথায় যেন নিজের সাথে বড় মিল খুঁজে পাই আজ আমার মধ্যাহ্নের শেষ বেলায়। ওঁর আবৃত্তি আমায় কবিতা ভালবাসতে শিখিয়েছে। প্রতিটি শব্দ বুঝে বলতে শিখিয়েছে।

উনি নেই এমনটা ভেবে কষ্ট পেয়েছি অনেক কারণ কোথাও আর পাঁচটা বাঙালির মতই তাঁকে অমর, অবয়, অক্ষয়, জানতাম, তবু সময়ের নিয়ম মেনে তিনি চলে গেলেন আবার গেলেন না।

"The weight of this sad time we must obey … The oldest hath borne most. We that are young/Shall never see so much, nor live so long".

সেরা
সত্যজিৎ
সত্যজিৎ রায়
প্রবন্ধ
সংগ্রহ

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

মহারাজা সেলাম

"ছেলেবেলার কোন ঘটনা মনে থাকবে আর কোনটা যে চিরকালের মতো মন থেকে মুছে যাবে সেটা আগে থেকে কেউ বলতে পারে না। মনে থাকা আর না-থাকা জিনিসটা কোন নিয়ম মেনে চলে না। স্মৃতির রহস্য এখানেই।" – (যখন ছোট ছিলাম)

"আয় আয় আয়রে আয়, মণ্ডামিঠাই হাঁড়ি হাঁড়ি" –

গুপী গাইন বাঘা বাইন চলচ্চিত্রের শেষ দৃশ্য। হাল্লার যুদ্ধক্ষেত্র। গান শেষ হল। সেনাদের ঘোরও কেটে গেল সেইসঙ্গে। ক্ষুধার্ত সৈনিকেরা আকাশ থেকে ঝরে পড়া মিহিদানা, পুলিপিঠে আর রসগোল্লার হাঁড়ির দিকে ছুটে চলল অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে মন্ত্রমুগ্ধ দর্শকদের নীরবতা হঠাৎ খানখান এক বালিকার কান্নায়। শুধু রুপোলী পর্দার অনাহারক্লিষ্ট সৈনিকেরাই কেন মিষ্টির ভুরিভোজে যোগ দেবে ? এহেন অবিচারে উথলে উঠলো তার ক্ষোভ আর অভিমান। সে বায়না জুড়ল যে তারও রসগোল্লা চাই। মেয়েটির মা কিছুটা অপ্রস্তুত হলেও রাগ করতে পারলেন না। সত্যি তো! ছবিটি দেখতে দেখতে মা নিজেও তো হারিয়ে গিয়েছিলেন গুপী, বাঘা আর ভুতের রাজার দেশে। শুণ্ডী আর হাল্লার রাজার বিরোধের এমন অভিনব পরিসমাপ্তিতে বিহ্বল তিনি নিজেও। তাই মেয়ের আবদারে বিচলিত হলেন না তেমন। কন্যের হাত ধরে প্রেক্ষাগৃহের বাইরে এসে খুঁজে বের করলেন মিষ্টির দোকান। সেখানে রাজভোগ খেয়ে তৃপ্ত হল দশমবর্ষীয়া বালিকাটি। জ্ঞান হয়ে থেকে এ গল্প আমি বেশ কয়েকবার শুনেছি আমার মার মুখে। কি করে যেন গল্পটা ভুলতে পারি নি। এ যে স্মৃতির রহস্য এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। বালিকাটি আমার নিজের দিদি। আরো অনেক বাঙালী শিশু কিশোরের মতোই আমি নিজেও এ সিনেমাটি প্রথম দেখেছি বাল্যবয়সে। তারপরেও আরো অনেকবার। প্রাপ্তবয়সে পৌঁছেও আকাশ থেকে মিহিদানা আর পুলিপিঠের বৃষ্টিতে বিস্ময়ঘোর কাটে না। পরিণত বয়সের বোধ ও অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারি 'শিশুর হৃদয় দিয়ে অনুভব করে পরিণত চিন্তার প্রয়োগে শিল্পসৃষ্টির দুর্লভ ক্ষমতার' অধিকারী না হলে এমন চিত্রনির্মাণ অসম্ভব।

"তোমাদের মধ্যে যারা 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবি দেখেছ, তারা জান যে হাল্লারাজার সেনাকে নিয়ে একটি মাত্র দৃশ্যই আছে – যদিও সে দৃশ্য বেশ ঘটনাবহুল। ..... এই সৈন্য সমাবেশের দৃশ্য তোলার জন্য একটা চমৎকার জায়গা বাছা হয়েছিল কেল্লার পুবদিকে। তিনদিকে ধূ ধূ প্রান্তর, গাছপালার চিহ্নমাত্র নেই, আর জমিতে বালি থাকলেও তা মোটেও গভীর নয় –" সুললিত ভাষা, তরতর করে এগিয়ে চলেছে লেখা। নদীর বুকে যেন ডিঙিনৌকাটি। পর্দায় যে গল্প বলা হয়ে গেছে তার নির্মাণের গল্প এ। চিত্রনির্মাণের নেপথ্যের কাহিনীও এমন মনোগ্রাহী ? কৌতূহলের বশে বেশ কয়েক পাতা উল্টোতেই বুঝলাম এ গ্রন্থ আসলে এক স্বর্ণখনি। সম্প্রতি কাজের সূত্রে বাংলার বাইরে বাস। এক বিকেলে স্থানীয় বন্ধুর বাড়ীর বইয়ের তাকে উদ্দেশ্যেহীন দৃষ্টিভ্রমণে আবিষ্কার করলাম লাল মেরুদণ্ডওলা বেশ বড়সড় একটি বই। প্রবন্ধ সংগ্রহ – সত্যজিৎ রায়। তত্ত্বে, তথ্যে, আঙ্গিকে ও বিষয়বিন্যাসে এ গ্রন্থ এক অপূর্ব সম্পদ। বাংলা চলচ্চিত্র জগতের রাজাধিরাজের চলচ্চিত্রের ভাষার মতোই কারুকার্যময় এ বইয়ের সাহিত্যভাষা।

প্রবন্ধকার যখন সত্যজিৎ রায় তখন বেশীর ভাগ প্রবন্ধের মূল উপজীব্য যে সিনেমা তা বলাই বাহুল্য। সত্যজিৎ রায় আর চলচ্চিত্র অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ছায়াছবিতে তিনি দৃশ্যের ও শ্রুতির সম্রাটপ্রতিম। কিন্তু দৃশ্যের আড়ালে তাঁর মনন চিন্তনের ঐশ্বর্য্যময় জগৎটি অনেকটাই অধরা থেকে যেত এই বইটি হাতে না পেলে। "চলচ্চিত্রের ইতিহাস

পরিধিতে সংক্ষিপ্ত হলেও বহু ঘটনায় আবর্তিত। "দু দুটি বিশ্বযুদ্ধ, বিশ্ববাণিজ্যের বাজারের ওঠাপড়া, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে অকল্পনীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তন ঘটেছে মানবজীবনের। অন্যান্য শিল্পের মতোই চলচ্চিত্রের মূল উপাদান হল মানবজীবন। তাই চলচ্চিত্র বিকাশের পথে মানবসমাজের পরিবর্তনগুলি চিহ্ন রেখে গেছে। এ বইয়ের প্রথম পর্ব 'চলচ্চিত্র ভাবনা'।" এ পর্বের বিভিন্ন নিবন্ধে চলচ্চিত্র জগতের নানাদিক আলোচনা করেছেন লেখক। রুপোলী পর্দায় যা ফুটে উঠছে ছায়া ও ছবি হিসেবে তার নেপথ্যের বহু প্রসারিত ও বৈচিত্র্যময় ক্ষেত্রটি আলোকিত হয়েছে তাঁর লেখায়। ফুটে উঠেছে ছায়াছবির জগতের অন্দরমহলের সুচারু দৃশ্যাবলী।

"বোড়াল গ্রামে পথের পাঁচালীর শুটিং হবে বলে ঠিক হল। এক শীতের সকালে লটবহর নিয়ে গ্রামের রাস্তা দিয়ে শুটিং এর জায়গায় চলেছি, এমন সময় কানে এল – 'ফিল্মের দল এয়েচে ! বল্লম নিয়ে লাফিয়ে পড়ো সব, বল্লম নিয়ে লাফিয়ে পড়ো' !" (পৃ ৩৭-দুই চরিত্র) পাঠকের আলাপ হয় বিকৃতমস্তিষ্ক সুবোধ দার সঙ্গে। পড়তে পড়তে ভুলে যেতে হয় যে বই পড়ছি। কল্পনার উড়াল সেই বোড়াল গ্রামে। সুবোধদার কান্ডকারখানা দেখছি চোখের সামনে। 'পথের পাঁচালী' ছবির শুটিং চলছে। হরিহরের ভূমিকায় অভিনেতা কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংলাপের একটি লাইন, "চাটুজ্যে মশাইকে বললুম, কাজটা হলে আপনাকে লুচি মোহনভোগ খাইয়ে দেব।" ক্যামেরা চলে উঠল। কানুবাবু শুরু করলেন সংলাপ। কিন্তু কি কাণ্ড ! মোহনভোগের জায়গায় বলে ফেললেন মোহনবাগান। এক দুবার নয়। টানা আটবার। ন বারের বার সঠিক সংলাপটি বলা হল। পাঁচ মিনিটের শট নিতে লাগলো ঝাড়া একটি ঘন্টা। 'তিনকন্যা'র 'সমাপ্তি' ছবির একটি দৃশ্যে প্রকৃতির খামখেয়াল কিভাবে চরম উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল বা 'জলসাঘর' ছবির জমিদার বিশ্বম্ভর রায়ের ভগ্নপ্রায় ফটক থেকে হাতী দেখার দৃশ্যটি কেন দুবার ধরে ক্যামেরাবন্দী করতে হওয়ার পরেও সর্বাংশে মনমতো হয় নি এমন টুকরো টুকরো নানা কাহিনী ছড়িয়ে আছে প্রথম পর্ব জুড়ে। পর্দার অন্য পারে পর্দার কুশীলবদের উদ্বেগ, মেহনত, দুশ্চিন্তা আর হাসিআনন্দময় যে জীবন তার ছবি ফুটে উঠেছে এইসব কাহিনীতে। বৈঠকি চালে তিনি বলে চলেন কেমন করে মেঘ, বৃষ্টি, আলো, হাওয়া, অভিনেতা অভিনেত্রীদের মেজাজমর্জি – এই সব কিছুরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে একটা ছবি তৈরীর ক্ষেত্রে। এ যেন এক অন্য ছায়াছবি। আর শুধু অভিনেতা অভিনেত্রীই বা কেন ? চিত্র নির্মাণের সঙ্গে জড়িত থাকে আরো কত মানুষের প্রতিভা আর পরিশ্রম। "সিনেমা তৈরীর কাজ মোটেই সহজ নয়। খেয়ালবশে ভাবতে ভাবতে মহাকাব্য রচিত হতে পারে, তুচ্ছ তুলির টানে বিরাট শিল্পসৃষ্টি হতে পারে। ..... কিন্তু ছায়াছবির ক্ষেত্রে মনোবিলাস চলে না। একটা নিতান্ত সাধারণ ছায়াছবি তোলবার সময়ও সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক কুশলীকে সজাগ থাকতে হয়।" (সিনেমা তৈরীর কথা, পৃ ২১৫)। চলচ্চিত্র শিল্পকে ঘিরে যে বিপুল কর্মকাণ্ড চলে তার সম্যক পরিচয় ছায়াছবির দর্শকেরা পান না। আকাশ থেকে মিষ্টির হাঁড়ি নামাতে প্রয়োজন হয়েছিল Trick Photography র (হাল্লারাজার সেনা পৃ-২৪৫), আর তার জন্য সাহায্য লেগেছিল নানারকম ক্যামেরা আর ল্যাবরেটরির। শিল্পোত্তীর্ণ চলচ্চিত্র নির্মাণের নেপথ্যে যে বিপুল আয়োজন তার ধারণা পায় পাঠক এই রচনাগুলি থেকে। প্রাণময় ও স্বচ্ছন্দ গদ্যভাষার এমন প্রকাশ দেশী বা বিদেশী প্রবন্ধ সাহিত্যে বড় একটা চোখে পড়ে না।

যে অসামান্য দক্ষতায় গ্রাম বাংলার আটপৌরে জীবন, পুকুর, ডোবা, বালক, বালিকা দিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন 'পথের পাঁচালী'র মতো অভিজাত চলচ্চিত্র ঠিক তেমন করেই নিজস্ব ভঙ্গীতে বইয়ের পাতায় পাতায় সিনেমার নির্মাণ আর সিনেমার তত্ত্বের মধ্যে সেতুবন্ধন ঘটিয়েছেন। এই গ্রন্থপাঠের অভিজ্ঞতা যেন মহাগুরুর পদতলে বসে চলচ্চিত্রের পাঠগ্রহণ ! "প্রকৃতপক্ষে দৃশ্য, বস্তু, কথা ও ধ্বনির সাহায্যে ছবিতে যা বলা হল, তার উপরে সংগীতের প্রলেপ দিয়ে বক্তব্যকে আরও পরিস্ফুট বা আরও আবেগময় করার প্রয়োজন যদি পরিচালক বোধ করেন তবেই তিনি আবহসংগীতের আশ্রয় নেন। অযথা আবহসংগীতের ব্যবহার ছবির ক্ষতি বই উপকার করতে পারে না। আর এটাও ঠিক যে আবহসংগীতের প্রয়োগ ছবির কোন দোষত্রুটি ঢাকতে পারে না।" (আবহসংগীত প্রসঙ্গে, পৃ ৭১) "যে লিখিত নকশাটি অনুসরণ করিয়া একটি চলচ্চিত্র রচিত হয়, তাহাকে বলা হয় চিত্রনাট্য।" (চিত্রনাট্য, পৃ -৯৮)

"ছবির উপমা যদি সাবলীলভাবে না আসে তা হলে সেটা আরোপিত বা কষ্টকল্পিত মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়।" (ছবি দেখার চোখ,পৃ ৮৯)

"লেখকের হাতে যেমন কথা, চলচ্চিত্র রচয়িতার হাতে তেমনি ছবি (image) ও শব্দ (sound)। ইমেজ এখানে শুধু ছবিই নয় – বাঙময় ছবি। আর ধ্বনি ? ধ্বনি ইমেজেরই পরিপূরক। এক ছাড়া অন্যের অস্তিত্ব নেই। চোখ, কান দুইই সজাগ না রাখলে চলচ্চিত্রের ভাষা বোঝা যায় না।" (আঙ্গিক, ভাষা ও ভঙ্গী পৃ ২৩)

এমন অজস্র মণিমুক্তো এ গ্রন্থ জুড়ে। লেখাগুলি পড়ে সিনেমা দেখার চোখ ফোটে পাঠকের। কমল হীরের ভারহীন দ্যুতি আলোকিত করে তার পথ। এমন অভিনব চক্ষুদান সত্যজিতের পক্ষেই সম্ভব।

বইয়ের দ্বিতীয় পর্ব 'স্মরণ', – বরণীয় মানুষদের নিয়ে সত্যজিতের স্মৃতিচারণ। সেইসব মানুষদের মধ্যে আছেন তাঁর পরম আত্মীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়। আছেন বাবা সুকুমার রায়। "আমার বাবার কথা" প্রবন্ধটিতেও তাঁর নিরাসক্ত ও নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গী মনে দাগ কাটে। "ঋত্বিকের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর মৌলিকতা" – দ্বিধাহীনভাবে বলেছেন একথা। দুঃখ পেয়েছেন উদয়শঙ্করের মতো প্রতিভা শেষ জীবনে কাজের সুযোগ পাননি বলে। স্বীকার করেছেন অকপটে যে শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ থাকলেও সেটার বিশেষ সদ্ব্যবহার করেন নি একটিই কারণে। তাঁর সামনে কি বলবেন তা স্থির করতে পারেন নি কখনো। আন্তরিকতা আর সততায় উজ্বল তাঁর স্মরণ পর্বের লেখাগুলি পাঠকের মন ছুঁয়ে যায়। বইয়ের বাকী তিনটি পর্ব – 'কথোপকথন', 'রকমারি', ও 'পরিশিষ্ট' স্বল্প পরিসর জুড়ে আছে। কিন্তু লাবণ্যময় ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণাত্মক গদ্যের উদাহরণ পাই সেখানেও। পাই তাঁর গভীর উপলব্ধির কথা। "উত্তম ছিল যাকে বলে খাঁটি প্রোফেশনাল।" 'অস্তমিত নক্ষত্র' প্রবন্ধটি পড়ে অবাক লাগে এই ভেবে যে, কোন বড় মাপের অভিনেতা, তিনি যদি বাণিজ্যিক ছবির তারকাও হন, তাঁকেও যথাযথ মর্যাদা দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি সত্যজিৎ। "রবীন্দ্রসংগীতে ভাববার কথা" প্রবন্ধটিতে তাঁর প্রখর মননের ছাপ সুস্পষ্ট। রচনাটিতে বাংলা গানের ঐতিহ্য, রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্য, এমনকি স্বরলিপির তারতম্য নিয়ে বিশদ আলোচনা কবিগুরুর গান নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে পাঠককে। এই প্রসঙ্গে আর একটি অসাধারণ প্রবন্ধ হল – 'মোৎজার্ট একা, অনন্য'।

সত্যজিৎ রায়ের প্রবন্ধসংগ্রহ প্রকৃত অর্থেই এক অনন্য পাঠ অভিজ্ঞতা। প্রবন্ধগুলির প্রধান আকর্ষণ ভাষার প্রসাদগুণ। কিন্তু পাঠ্যগুণ বজায় রাখতে গিয়ে প্রাবন্ধিকের দায় কোথাও অস্বীকার করেন নি তিনি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লেখনশৈলীতে অটুট আছে তত্ত্ব ও তথ্যের ভারসাম্য। সুবিখ্যাত মার্কিন কমেডির ইতিহাস, সাহিত্য ভাষা আর চলচ্চিত্রের ভাষার পার্থক্য, রুশ নির্বাক ছবিতে আইজেনস্টাইন, পুদভকিন ও ডভচেঙ্কোর ভাষাগত অবদান, ক্রুফোর ফ্রিজ শট বা গোদারের 'Breathless' ছবিতে ব্যয়সংক্ষেপের প্রচেষ্টা – নানা বিচার ও বিশ্লেষণ সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন পাঠকদের কাছে। অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণ আর অসামান্য সাহিত্যগুণের সমন্বয়ই প্রবন্ধগুলির একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। প্রয়োজনে তাঁর লেখা তুলনামূলকও বটে। কালের মানচিত্রে শুধু সমকাল আর অতীতে নয়, ভাবীকালেও ঘোরাফেরা করে তাঁর প্রখর মনন। সত্যজিৎ রায়ের 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' নিসঃন্দেহে এক আলোকময় জগতের সন্ধান দেয় পাঠককে। সেইসঙ্গে শিল্পের ইতিহাসের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ হয়ে থাকে এক মহামূল্যবান সংযোজন।

শেষ থেকে শুরু করলাম আজ। প্রাবন্ধিক সত্যজিৎকে আবিষ্কার করেছি প্রাপ্তবয়সে। কিন্তু লেখক সত্যজিতের সঙ্গে পরিচয় তো সেই শৈশব আর কৈশোরের দিনগুলিতে। সেই সত্যজিৎ ছোটগল্পকার সত্যজিৎ, রহস্যরোমাঞ্চ কাহিনীর লেখক সত্যজিৎ। "কানের মধ্যে আজই রাত্রে শোনা একটা ছড়া বার বার ফিরে ফিরে আসছে –

সাপের ভাষা সাপের শিস / ফিস্ ফিস্ ফিস্ ফিস্ !
বালকিষণের বিষম বিষ / ফিস্ ফিস্ ফিস্ ফিস্ !

ক্রমে সে ছড়াটাও মিলিয়ে এলো। বুঝতে পারলাম একটা ঝিম্‌ঝিমে অবসন্ন ভাব আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।" (খগম)

গল্প বলার কি অসাধারণ সম্মোহনী শক্তি। আজও তার আকর্ষণ বিন্দুমাত্র কমে নি। আর এমনটাই তো প্রত্যাশিত। উপেন্দ্রকিশোর আর সাক্ষাৎ সুকুমার রায়ের মতো শিশু সাহিত্যিকের উত্তরসূরী তিনি। তাই কিছুটা বিলম্বে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করলেও পাঠকের মন জয় করতে দেরী হয় নি তাঁর। চল্লিশ বছর বয়সে বিশ্ববন্দিত এই চলচ্চিত্রকারের লেখকসত্ত্বার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কিছুটা রাজশেখর বসুর মতো। কিন্তু সাহিত্যের জগতেও নিত্যনতুন সৃষ্টির ফসল ফলিয়েছেন তিনি। শিশু ও কিশোর সাহিত্যের স্রষ্টা হিসেবে সত্যজিৎ রায় নামটি নক্ষত্রের মহিমায় মণ্ডিত। কিন্তু পরিণত বয়সের পাঠকের কাছেও কাহিনীগুলি সমান চিত্তাকর্ষক। আর এখানেই সত্যজিতের লেখনীর মাহাত্ম্য। তুখোড় মেধাবী ও অসীম সাহসী গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্যকাহিনী, বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী প্রফেসর শঙ্কুর ডায়রির পাতা থেকে উঠে আসা রোমাঞ্চময় উপখ্যান বা তাঁর ছোটগল্প – কোথাও পুনরাবৃত্তি নেই কখনো। লেখাগুলির বিষয় ও স্বাদের বৈচিত্র্য চমকপ্রদ।

গোয়েন্দা ফেলুদার চরিত্রটি বাংলা রহস্য রোমাঞ্চ গল্পের জগতে এক অনবদ্য সৃষ্টি। ফেলুদার সহায় হল মগজাস্ত্র। অসামান্য পর্যবেক্ষণশক্তির অধিকারী সে। সত্যজিতের গোয়েন্দা গল্পের পটভূমি কখনো দার্জিলিং কখনো বেনারসের গলি। আবার কখনো রাজস্থান। প্রতিটা কাহিনীর ঘটনাস্থল নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। তাঁর শক্তিশালী লেখনীর পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরণের চরিত্রচিত্রণেও। আর এ কথা তাঁর অন্যান্য ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে আঁকার ক্ষমতা ছিল তাঁর। তাঁর নিজের সৃষ্ট গোয়েন্দা চরিত্র প্রদোষ মিত্রের মতো গভীর পর্যবেক্ষণশক্তি ছিল তাঁর। আর তাইজন্যই সম্ভব হয়েছে বিপিনবাবু, নিশিকান্ত, পটল বাবু, সিধু জ্যাঠা আর লালমোহনবাবুর মতো জীবন্ত সব চরিত্রসৃষ্টি। তাঁর গোয়েন্দা গল্পগুলিতে রহস্যের ঘনঘটা আর কৌতুকের সরসতার অতুলনীয় সংমিশ্রণ ঘটেছে। জীবনের অন্ধকারময় দিক আর হাসিখুশিভরা দিক একইসঙ্গে বুনে দেওয়ার এই কাজটি মহান শিল্পী নাহলে সম্ভব হয় না। এরই পাশাপাশি দেখি বিজ্ঞানী প্রফেসর শঙ্কুর ডাইরির পাতা থেকে উঠে আসা বিচিত্র কাহিনীগুলি। অভিনবত্ব সেখানেও। কোন একটি রোমাঞ্চকাহিনী অন্যটার মতো নয়। এর সঙ্গে আছে তাঁর ছোটগল্পের বিপুল বৈচিত্র্যময় সম্ভার। কোন একটি গল্প অন্যটির সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

'ওই যে বাবলা গাছ। ওটা পেরিয়ে মিনিটখানেক হাঁটলেই ওভারব্রিজ। আকাশ মেঘে ভরা, তবে ঘন কাল মেঘ নয়, ছাইয়ের মতো ফিকে মেঘ। বাতাস নেই, তাই সমস্ত মেঘ যেন এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।' (রতনবাবু আর সেই লোকটা)

সহজ অথচ ব্যঞ্জনাময় গদ্য। এই প্রসাদগুণ সত্যজিতের সবধরণের লেখার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সব বয়সের সব পাঠকের মনোগ্রাহী তাঁর ছোটগল্প, প্রবন্ধ, গোয়েন্দাকাহিনী বা স্মৃতিচারণ। এ বছর তাঁর জন্মশতবার্ষিকী। শিল্পোত্তীর্ণ ছায়াছবি নির্মাণের জন্য তাঁর খ্যাতি বিশ্বে আজও অম্লান। পৃথিবীর নানা দেশের বহু জ্ঞানীগুণী মানুষ চিত্রপরিচালক হিসেবে তাঁর প্রতিভার বিশ্লেষণ করেছেন। ভবিষ্যতেও করবেন। তবে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রটিও যে সত্যজিতের বহুমুখী প্রতিভার অবদানে কোন অংশে কম সমৃদ্ধ হয় নি। কখনো কখনো মনে হয় তাঁর প্রতিভার এই দিকটিতে আরো গভীরভাবে আলোকপাত করার সময় হয়তো পার হয়ে যাচ্ছে। কর্মজীবনের কোন পর্যায়েই লেখালেখি তাঁর পুরো সময়ের কাজ ছিল না। কিন্তু তাঁর প্রতিটি রচনা সময়ের প্রহরা এড়িয়ে আজও পাঠকের সম্পূর্ণ মনোযোগ দাবী করে। বিষয়বস্তুর মৌলিকতায়, চরিত্রচিত্রণের কুশলতায় আর গল্প বলার সহজ গতিময়তায় তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি তাঁর চলচ্চিত্রের মতোই শিল্পোত্তীর্ণ। আর তাই তাঁর প্রতিটি রচনা সময়ের প্রহরা এড়িয়ে আজও পাঠকের সম্পূর্ণ মনোযোগ দাবী করে।

Amlan Bose – born and brought up in Jamshedpur and Patna , had graduated from IIT Kharagpur and served the Engineering fraternity in various positions in top rated Indian and Foreign companies abroad for more than four decades . A pleasant and adorable personality , he was University / college blue in cricket , Hockey, soccer and Table tennis and has a spontaneous flow of literary talents in creating, directing and producing unique stage work mostly on his own scripts. He produced and directed several Dance drama and Drama in Calcutta, Delhi and also for the Indian Embassy during his long tenure in Jakarta. He enjoys writing short stories, travelogue and mysterious stories.

ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায় – জন্ম বারাণসী শহরে । দীর্ঘকাল মেলবোর্ণ শহরের বাসিন্দা । এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী সাহিত্যে এম. এ. । মেলবোর্ণের মনাশ ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটর সায়েন্সে ডিপ্লোমা । বিভিন্ন সরকারী রিসার্চ বিভাগে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসন ও অধ্যাপনার কাজে যুক্ত ছিলেন । দেশ, সানন্দা, আনন্দবাজার পত্রিকা, নবকল্লোল এবং বর্তমান সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখা । উপন্যাস এবং ছোট গল্প প্রকাশিত হয়েছে শারদীয় দেশ, সানন্দা ও আনন্দলোকে । অবসর সময়ে বই পড়তে ভালবাসেন । ভালবাসেন ভ্রমণ । ছন্দসীর প্রকাশিত গ্রন্থ – অভিযান (আনন্দ), মায়াজাল (আনন্দ), ছায়া পরিসর (লাল মাটি প্রকাশন), নির্বাচিত গল্প প্রথম ভাগ (দাশগুপ্ত পাব্লিশার্স) এবং Seven Favourite Stories – translation of seven short stories by Sirshendu Mukhopadhyay (Dasgupta Publishers) । ওয়েব সাইট : www.bando.com.au

দেবীপ্রিয়া রায় – লিখছেন স্কুল ও কলেজের দিন থেকে । পেশায় দর্শন ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপিকা ও গৃহিণী । কাশীর প্রবাসী বাঙালী পরিবারের মেয়ে দেবীপ্রিয়া কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ সালে ডক্টরেট করে বিবাহসূত্রে সেই বছরেই আমেরিকা এসে শিকাগো শহরে বাসা বাঁধেন । গত ৪০ বছর শিকাগোর বাঙালী ও অবাঙালী সমাজের সাথে নানা ভাবে জড়িয়ে রয়েছেন । সাহিত্য চর্চা দেবীপ্রিয়ার নেশা । শিকাগোর উন্মেষ সাহিত্য গোষ্ঠীর তিনি অন্যতম সদস্য ।

ইন্দিরা চন্দ – জন্ম ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ । মেয়েবেলা কেটেছে মহারাষ্ট্র-র নাগপুরে । তারপর কোলকাতা । মনোবিদ্যা নিয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা করতে করতেই বিয়ে । তারপর কর্মসূত্রে রাজস্থান, গুজরাট, মুম্বাইতে থেকে ২০০১ সাল থেকে দেশের বাইরে । ওমান এবং সংযুক্ত আমিরশাহীতে বেশ কিছু বছর কাটিয়ে ২০০৮ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়ার পার্থ-এ পাকাপাকি বাস । পেশায় হলেও নেশায় চিরকালই লেখালেখি । কবিতা, গান, নাটিকা, নাটক সব ক্ষেত্রেই নিজের প্রতিভার ছাপ রেখেছেন তিনি । পার্থ-এর বঙ্গরঙ্গ থিয়েটার গোষ্ঠী ওনার লেখা মঞ্চস্থ-ও করেছে । বহুদিন ধরে কলম ধরলেও তুলি ধরেছেন এই প্রথম । পুরোপুরি স্বশিক্ষিত শিল্পী । নাচ এবং গানে প্রশিক্ষণ থাকলেও আঁকা শেখেননি কোনোদিন । কিন্তু কবিতার বিষয়বস্তু এবং ছন্দের মতন ছবিগুলি রঙের ব্যবহার আর তুলির টান মন কাড়ে তার মননশীলতায় ।

Dr. Jayanti Bandyopadhyay – is a Professor of Accounting and the Graduate Program Coordinator at the Bertolon School of Business at Salem State University in Salem, Massachusetts. Jayanti co-founded SETU (Stage Ensemble Theatre Unit), a not-for-profit English theatre group portraying Indian origin plays in English in Boston, Massachusetts. She loves to write stories occasionally and is a passionate cook. She was born in Kolkata, India. She currently lives in Boston with her husband, Gautam.

মহুয়া সেন মুখোপাধ্যায় – বেড়ে ওঠা কলকাতায়, বসবাস বস্টনে । লেখালেখি শুরু ২০১৬ তে । ছোট গল্প এবং আর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছে বাংলা লাইভ, পরবাস, কল্পবিশ্ব ওয়েব ম্যাগাজিনে, আনন্দবাজার, সাপ্তাহিক বর্তমান, সংবাদ প্রতিদিন, রোববারে । ২০২০র বইমেলায় প্রকাশিত প্রথম বই-ছোট গল্প সংকলন-ক্যালাইডোস্কোপ, দে'জ পাবলিকেশন থেকে ।

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায় – শিকাগোর বাসিন্দা । পেশায় শিক্ষিকা । আর নেশায় পড়ুয়া । বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই লেখাপড়া করার অভ্যাস আপাতত । রঞ্জিতার প্রেম হল বাংলা ভাষা, সাহিত্য আর মাঝে মাঝে কিছু লেখালিখি । রঞ্জিতা 'বাতায়ন' পত্রিকার সম্পাদিকা । গত কয়েক বছর ধরে আমেরিকার বিভিন্ন 'লিটল ম্যাগাজিনে' ওনার লেখা বের হচ্ছে । শিকাগোর স্থানীয় সাহিত্যগোষ্ঠী উন্মেষের সঙ্গে উনি প্রায় এক দশক ধরে যুক্ত । সহলেখিকা হিসেবে রঞ্জিতার দুটি বই এযাবৎ প্রকাশিত হয়েছে – ''Bugging Cancer'' আর ''Three Daughters Three Journeys'' । সাহিত্যের হাত ধরে ভৌগোলিক সীমানার বেড়া ভাঙায় বিশেষ আস্থা রঞ্জিতার ।

সঞ্জয় চক্রবর্তী – অধুনা সিডনী নিবাসী । পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু নেশায় আদ্যন্ত কবিতাপ্রেমিক । বাতায়ন থেকে প্রকাশিত সঞ্জয়ের প্রথম কবিতার বই "মেঘযাপন" পাঠক মহলে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছে । সঞ্জয়ের অন্য পরিচিতি গীতিকার হিসেবে । কলকাতার জনপ্রিয় গায়ক ও সুরকারেরা সঞ্জয়ের লেখা গানে কাজ করছেন ।

শঙ্খ ভৌমিক – পেশায় অধ্যাপক; নেশায় নাট্যছাত্র ও সাহিত্যপ্রেমী । অভিবাসী জীবনের টুকরো যাপন নিয়ে কখনো নাটক, কখনো ছোট গল্প লেখা ।

শ্যামলী আচার্য – কর্মসূত্রে 'আজকাল', 'আবার যুগান্তর', 'খবর ৩৬৫' ও অন্যান্য বহু পত্র-পত্রিকায় এবং ওয়েবজিনে ফিচার এবং কভারস্টোরি লেখার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। 'একদিন' পত্রিকার বিভাগীয় সম্পাদক হিসেবে কাজের সুযোগ। গাংচিল প্রকাশনা থেকে তাঁর প্রথম গল্প সংকলন 'অসমাপ্ত চিত্রনাট্য'; সংকলনের গল্পগুলি বিভিন্ন সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকা, সানন্দা, এই সময়, তথ্যকেন্দ্র পত্রিকায় প্রকাশিত। "রা" প্রকাশন থেকে তাঁর দ্বিতীয় গল্প সংকলন 'প্রেমের ১২টা'; সংকলনের গল্পগুলি বিভিন্ন সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকা, সানন্দা, উনিশ-কুড়ি, একদিন, প্রাত্যহিক খবর এবং বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত। বহুস্বর পত্রিকার পক্ষ থেকে মৌলিক গল্প রচনায় 'অনন্তকুমার সরকার স্মৃতি পুরস্কার'। অভিযান পাবলিশার্স আয়োজিত মহাভারতের বিষয়ভিত্তিক মৌলিক গল্প রচনায় প্রথম পুরস্কার। এছাড়াও গবেষণাঋদ্ধ বই 'শান্তিনিকেতন'। প্রকাশক 'দাঁড়াবার জায়গা'। ১৯৯৮ সাল থেকে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের এফ এম রেইনবো (১০৭ মেগাহার্তজ) ও এফ এম গোল্ড প্রচারতরঙ্গে বাংলা অনুষ্ঠান উপস্থাপিকা। কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রের ভয়েস ওভার আর্টিস্ট।

সিদ্ধার্থ দে – আই আই টি খড়গপুরের মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিঙের স্নাতক। স্নাতোকত্তর পড়াশুনা আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ নিউ হ্যামপশায়ারে। ১৯৯০ সাল থেকে পাকাপাকি ভাবে অস্ট্রেলিয়াতে। দীর্ঘদিন ক্যানবেরা নিবাসী। ২০১৫-তে কর্মজীবন শেষ করে আপাতত সাহিত্য চর্চা, ভ্রমণ, টুকটাক লেখালেখি নিয়ে আছি। আর হ্যাঁ – ফেসবুকে, ওয়াটস্অ্যাপে ইত্যাদি সামাজিক মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে ছড়ানো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডাও জীবনের একটা বড় অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে হালে। আমার মূলত ব্লগধর্মী কিছু লেখা desidd.wordpress.com সাইটটিতে সংকলিত করেছি।

শ্রাবনী রায় আকিলা – পড়তে, লিখতে, বলতে, শুনতে, জানতে, দেখতে, ভাবতে ভালোবাসেন। এখনও পর্যন্ত লিখেছেন আনন্দবাজার, এই সময়, দুকূল, বর্তমান এবং উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকায়। নিজের একটি ব্লগও আছে। তবে সবথেকে বেশি স্বস্তি বোধ করেন নিজের ফেসবুক ওয়ালে নিয়মিত, স্বাধীন ও ইচ্ছামত লিখতে।

Sudipta Bhowmik — He lives in USA. He is an engineer by profession but his passion is drama. His plays have been staged in different cities of US and India. His plays have been translated in Hindi, Marathi and English. He is a member of Dramatist Guild of America and founder of his own theater group in New Jersey called ECTA (Ethnomedia Center Of Theater Arts).

সৌমিত্র চক্রবর্তী – পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে আর্থিকভাবে দুর্বল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন। তাদের জন্যেই ভালোবাসার উপহার 'খেলার ছলে' পত্রিকার মূল কান্ডারি। তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ইতিমধ্যেই 'দেশ', শারদীয়া আনন্দবাজার, বা সাপ্তাহিক বর্তমানের মত বহুল প্রচারিত পত্রিকায় জায়গা পেতে শুরু করেছে। এবারেই প্রথম কলম ধরেছেন বাতায়নের পাঠকদের জন্য।

সুবীর রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় – কর্মসূত্রে Accountant, অস্ট্রলিয়ার Perth শহরে ৩০ বছরের বাস। বাংলা সাহিত্য তার প্রাণ। বাংলা সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় টান এবং ভালবাসা। এছাড়া নাটক, গান শোনা ও কবিতা পড়ে অবসর কাটান। একজন আদ্যপ্রান্ত রোমান্টিক মানুষ, আড্ডা মারতে ভালবাসেন।

অধমের নাম **সুপ্রতীক মুখার্জী**। পার্থিব বাসিন্দা। ৯টা-৫টার চাকর। পিদিমের মত টিম্‌টিমে বুদ্ধি, তা'ও নেভে না !!

তাপস কুমার রায় – যুক্তরাষ্ট্র সরকারে অর্থনীতির গবেষক তাপস কুমার রায় প্রাথমিকভাবে একজন চিত্রশিল্পী। কনেক্টিকাট বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাথরিন মায়ারের কাছ থেকে ফাইন আর্টস প্রশিক্ষণ লাভ করেন। তাপসের লেখায় ধরা পড়ে প্রবাস-এর একাকীত্ব এবং বাজারি সভ্যতায় তার বিপণ্নতা। তার লেখা পূর্বে দেশ বা দুকুল-এর মত আন্তর্জাতিক বাংলা ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে এবং এছাড়াও বাঙালি চলচ্চিত্র গান হয়েছে। 'ঘর খোঁজা সন্ধ্যারা' তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা সংগ্রহ।

তনিমা বসু, পদার্থ বিদ্যায় স্নাতক। ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানের বায়োস্ট্যাটিস্টিক্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সুযোগ করে দিয়েছে সংখ্যাতত্ত্ব ব্যবহার করে অন্তর্হিত সত্য উদ্‌ঘাটন করার। বিজ্ঞানের ছাত্রীর অবসর সময় কাটে কাগজে আকিঁবুকি করে, বিভিন্ন মিডিয়ামের সাথে পরিচিত হয়ে – কখনো কাগজে, কখনো স্ক্রিনে। ভালোবাসে ছবি তুলতে রঙীন প্রকৃতির এবং আপনজনদের। প্রথম গল্প লেখা হাত।

দহন

সন্ধে নামছে তখন তোমার মুখে
আকাশে দূরের তারা চেনাচ্ছ তুমি ----
আমরা দেখছি আগুনের বন্ধুকে।
জীবন ধ্রুবক। মৃত্যুই মরসুমি।

একজীবনের এতগুলো সংলাপ
সব ঠিকঠাক আদায়ের পরে ছুটি।
আমরা দেখছি শ্রান্ত পায়ের ছাপ,
ভালবাসা তবু দেখায়নি বিচ্যুতি।

সন্ধে নামছে আবার তোমার কাছে।
এবার তোমাকে নিয়ে যাব বলে আসা।
কজন মানুষ প্রবাহের মতো বাঁচে ?
চিনিয়ে দিচ্ছ দূরের তারার ভাষা।

দাহ মুছে যাক। দহন জাগুক দাগে।
মহীরুহ গেলে নতজানু হয় ঝড়ও।
ছাই উড়ে যেতে এক মুহূর্ত লাগে।
তোমার আগুন, আকাশের চেয়ে বড় ----

– শ্রীজাত

বাতায়নের শ্রদ্ধাঞ্জলি